# ছড়ার ছবি

# ছড়ার ছবি

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. 4006
DATE 4/9/09
CALCUTTA

নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত

IMPERIAL LIBRARY
No 1852.
Date 15.8.38.
CALCUTTA

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

# ছড়ার ছবি

প্রথম সংস্করণ ... ... .. আশ্বিন, ১৩৪৪

মূল্য—দেড় টাকা

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম,
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বৌমাকে

# ভূমিকা

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্য-সৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হাল্‌কা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উল্‌টো কথা বলে। এক হচ্ছে আলোর রূপ ঢেউয়ের রূপ, আর হচ্ছে সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধু ভাষার রূপ ঢেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা,—শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম। বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাত্‌লা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিবেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।

সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত,—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার-চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# সূচী


| বিষয় | প্রথম পংক্তি | | পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| জলযাত্রা | নৌকো বেঁধে কোথায় গেল | .. | ১ |
| ভজহরি | হংকঙেতে সারা বছর | ... | ৪ |
| পিস্‌নি | কিশোর-গাঁয়েব পুবের পাড়ায় | ... | ৮ |
| কাঠের সিঙ্গি | ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমাব | ... | ১১ |
| ঝড় | চেয়ে দেখ্‌রে নাম্‌ল বুঝি ঝড় | .. | ১৩ |
| খাটুলি | একলা হোথায় বসে আছে | ... | ১৫ |
| ঘরেব খেয়া | সন্ধ্যা হয়ে আসে | ... | ১৮ |
| যোগীনদা | যোগীনদাদার জন্ম ছিল | ... | ২০ |
| বুধু | মাঠের শেষে গ্রাম | .. | ২৫ |
| চড়িভাতি | ফল ধরেছে বটের ডালে | ... | ২৭ |
| কাশী | কাশীব গল্প শুনেছিলুম | ... | ৩০ |
| প্রবাসে | বিদেশমুখো মন যে আমাব | ... | ৩৫ |
| পদ্মায় | আমার নৌকো বাঁধা ছিল | ... | ৩৮ |
| বালক | বয়স তখন ছিল কাঁচা | ... | ৪০ |
| দেশান্তরী | প্রাণধারণের বোঝাখানা | ... | ৪৩ |
| অচলা বুড়ি | অচল বুড়ি, মুখখানি তার | ... | ৪৬ |
| সুধিয়া | গয়লা ছিল শিউনন্দন | ... | ৫০ |
| মাধো | রায় বাহাতুব কিষনলালের স্যাকরা | ... | ৫৬ |
| আতার বিচি | আতার বিচি নিজে পুঁতে | ... | ৬০ |
| মাকাল | গৌরবর্ণ নধর দেহ | ... | ৬৩ |
| পাথর পিণ্ড | সাগরতীরে পাথরপিণ্ড | ... | ৬৬ |
| তালগাছ | বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে | ... | ৬৮ |
| শনির দশা | আধবুড়ো ঐ মানুষটি | ... | ৭০ |
| রিক্ত | বইছে নদী বালির মধ্যে | ... | ৭৩ |

| বিষয় | প্রথম পংক্তি | | পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| বাসাবাড়ি | এই সহরে এই তো প্রথম আসা | ... | ৭৫ |
| আকাশ | শিশুকালের থেকে | .. | ৭৮ |
| খেলা | এই জগতের শক্ত মনিব | | ৮১ |
| ছবি-আঁকিয়ে | ছবি-আঁকার মানুষ ওগো | ... | ৮৩ |
| অজয় নদী | এককালে এই অজয় নদী | ... | ৮৬ |
| পিছু-ডাকা | যখন দিনের শেষে | .. | ৮৮ |
| ভ্রমণী | মাটির ছেলে হয়ে জন্ম | . | ৯০ |
| আকাশ প্রদীপ | অন্ধকারের সিন্ধুতীরে | | ৯২ |

# ছড়ার ছবি

# জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা' ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে ক্ষেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিন পোয়া,
যদু ঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে,
মালসি যাব, পুঁটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদেব ঘরে সেরে নেব দুপুর বেলার খাওয়া;
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
এক পহরে চলে যাব মুখলুচরেব ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন,
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে করব রাত্রিযাপন।
তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব আকাশের দিকে
একটু করে আঁধার হবে ফিকে।

বাঁশের বনে একটি দুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর পথের ঐ পারেতে গোঁসাই বাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।

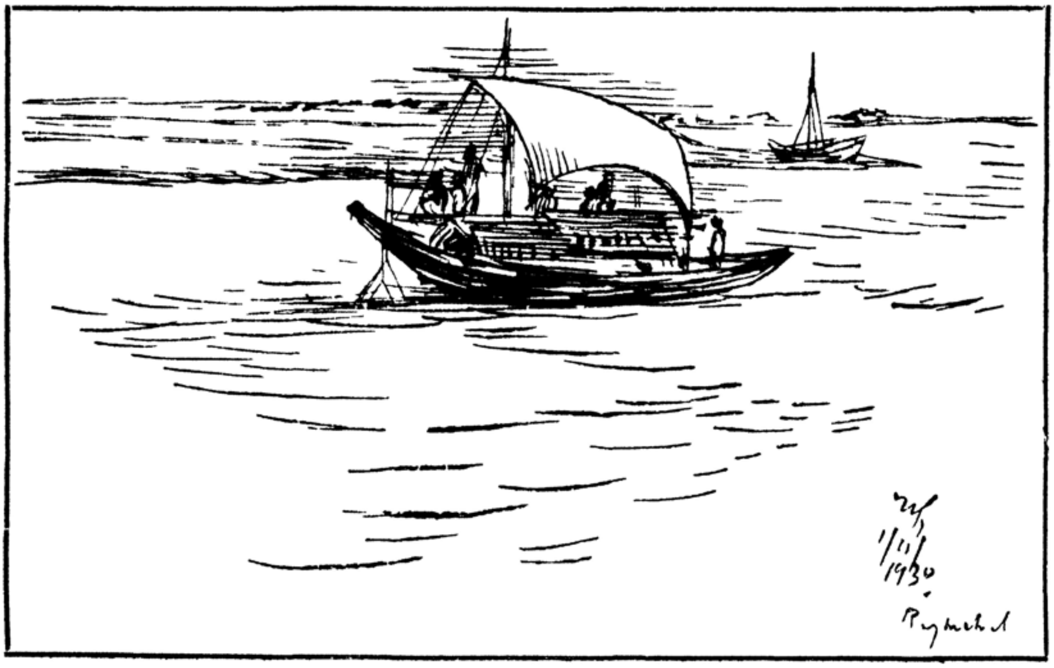

উস্খুস্ করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়,
রাঙা রঙের ছোঁয়া দেবে দেউল চূড়োর মাথায়।
বোষ্টমি সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকাল বেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
হেলে দুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।

আমারো পথ হাঁসের যে পথ, জলের পথে যাত্রী,
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।
সাঁতার কাটব জোয়ার জলে পৌঁছে উজিরপুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্দুরে।
গিয়ে ভজনঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনে ডাঁটা।
পৌঁছব আটবাঁকে,
সূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুলতলায় রাঁধব আপন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।
মাখনাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে
বন-ঝাউঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকা-দিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধার তলায় কোথায় হবে লীন॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# ভজহরি

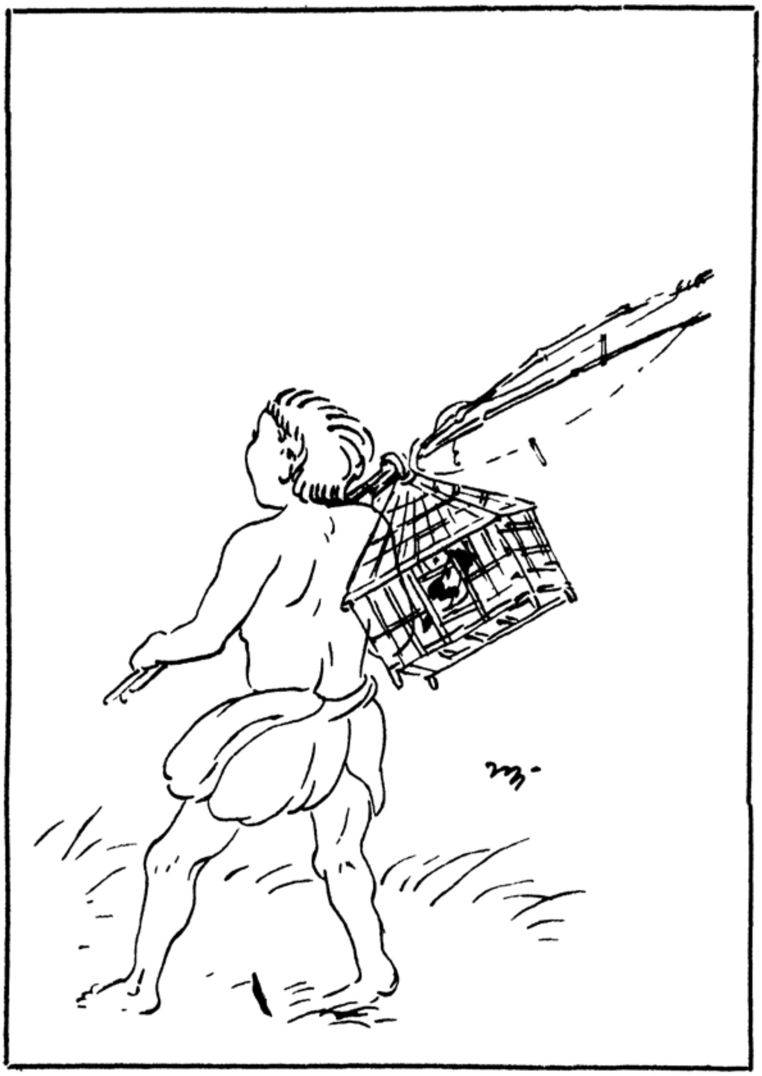

হংকঙেতে সারাবছর আপিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা,

দিয়েছিলেন মাকে,
ঢাকার নিচে যখন তখন শিষ দিয়ে সে ডাকে।
নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িং ধরে।
পাড়ায় পাড়ায় যত পাখি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা,
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে, ঝাপট দিত পাখা।
কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান,
অসুখ করলে হলুদ জলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িং ঘুমোয় না একরত্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলি ধরপাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।

একদিন সে ফাগুন মাসে মা'কে এসে বলল,
গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।
শুনে আমার লাগল ভারি মজা,
এই আমাদের ভজা,
এরো আবার মেয়ে আছে, তারো হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
সুধাই তাকে বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে।
ভজু বললে, খাঁচার বাজ্যে নইলে কি মান র'বে।
কেউবা ওবা দাঁড়ের পাখি, পিঁজ্‌রেতে কেউ থাকে,
নেমন্তন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।

মোটা মোটা ফড়িং দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।

এমনি হবে ধুম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারো রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা,
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম,
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানা রকম।
আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে,
মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।
ডাকবে যখন টিয়ে
বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে ॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

---

# পিস্‌নি

কিশোর-গাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি,
পিস্‌নি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি।

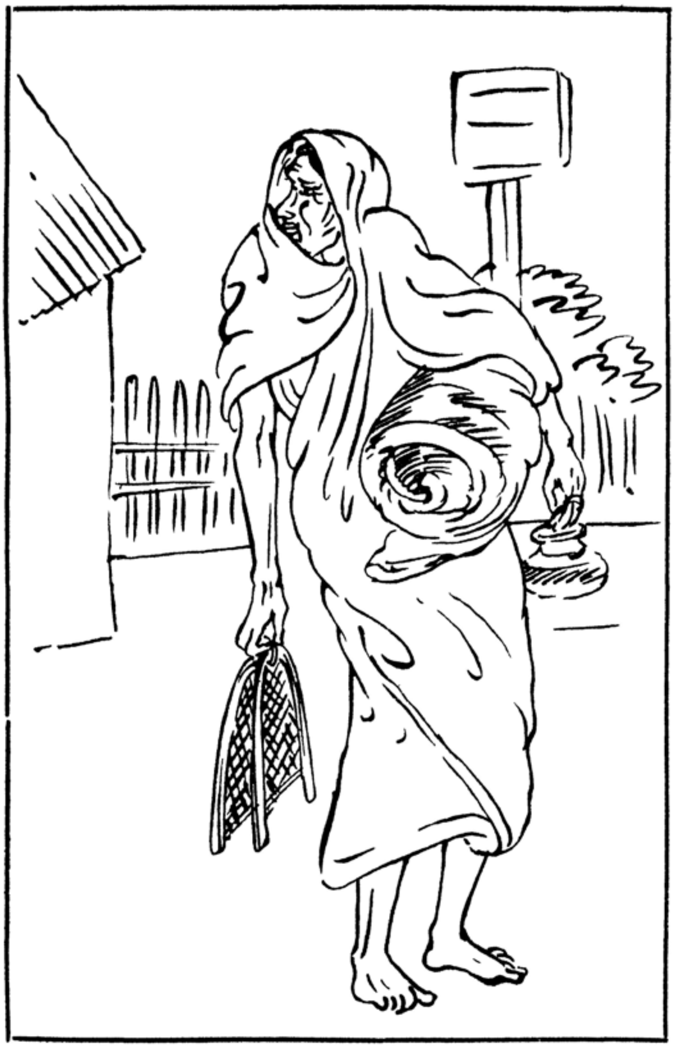

একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল ষোলো,
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহ্য তার হোলো।
আর কোনো ঠাঁই হয়তো পাবে আর কোনো এক বাসা,
মনের মধ্যে আঁকড়ে থাকে অসম্ভবের আশা।
অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি,
অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি।
তাই দিয়ে সে তুলল বেঁধে ছোট্ট বোঝাটাকে
জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁখে।
বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,
মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধূলির তলে।
সুধাই যবে কোন্ দেশেতে যাবে,
মুখে ক্ষণেক চায় সকরুণ ভাবে,
কয় সে দ্বিধায়, কী জানি ভাই, হয়তো আলমডাঙা,
হয়তো সান্‌কিভাঙা,
কিংবা যাব পাটনা হয়ে কাশী।
গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি,
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,'
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে।
গভীর নিশাস ফেলে
চুপটি করে ভাবে
এমন ক'রে আর কতদিন যাবে।
দূরদেশে তার আপন জনা,—নিজেরি ঝঞ্ঝাটে
তাদের বেলা কাটে।

তারা এখন আর কি মনে রাখে
এত বড়ো অদরকারী তাকে।
চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপ্‌সা যে তার মন,
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।
স্টেশন মুখে গেল চলে, পিছনে গ্রাম ফেলে,
রাত থাকতে, পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।
দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে॥

---

# কাঠের সিঙ্গি

ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়,
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়।

গলায় বাঁধা রাঙা ফিতের দড়ি,
চিনে মাটির ব্যাং বেড়াত পিঠের উপর চড়ি'।
ব্যাংটা যখন পড়ে যেত ধম্‌কে দিতেম ক'ষে,
কাঠের সিঙ্গি ভয়ে পড়ত বসে।
গাঁ গাঁ করে উঠছে বুঝি, যেম্‌নি হোত মনে
চুপ্ করো—যেই ধম্‌কানো, আর চম্‌কাত সেইখনে।
আমার রাজ্যে আর যা থাকুক সিংহভয়ের কোনো
সম্ভাবনা ছিল না কথ্‌খোনো।
মাংস ব'লে মাটির ঢেলা দিতেম ভাঁড়ের পরে,
আপত্তি ও করত না তার তরে।
বুঝিয়ে দিতেম গোপাল যেমন সুবোধ সবার চেয়ে
তেম্‌নি সুবোধ হওয়া তো চাই যা দেব তাই খেয়ে।
ইতিহাসে এমন শাসন করে নি কেউ পাঠ,
দিবানিশি কাঠের সিঙ্গি ভয়েই ছিল কাঠ।
খুদি কইত মিছিমিছি, ভয় করছে, দাদা,
আমি বলতেম, আমি আছি, থামাও তোমাব কাঁদা,—
যদি তোমায় খেয়েই ফেলে এমনি দেব মার
ত্ব চক্ষে ও দেখবে অন্ধকার।
মেজদিদি আর ছোড়্‌দিদিদের খেলা পুতুল নিয়ে
কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিয়ে।
নেমন্তন্ন করত যখন যেতুম বটে খেতে,
কিন্তু তাদের খেলার পানে চাইনি কটাক্ষেতে।
পুরুষ আমি, সিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে,
এমন খেলার সাহস বলো ক'জন মেয়ের আছে॥

---

# ঝড়

দেখ্‌রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ঐ করে ধড়্‌ফড়্‌।
আকাশতলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠল বাজি',
শীঘ্র তরী বেয়ে চল্‌রে মাঝি।
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে' ফুলে',
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।
ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ডরে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির পরে।
হাওয়ার বিষম ধাক্কা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে,
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।
বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চম্‌কে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ঐ রে, মাঝি, খেপ্‌ল গাঙের জল,
লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্‌।
সেই যেখানে জলের শাখা, চখাচখীর বাস,
হেথা হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা।
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।

হোথায় জেলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে বসে বসে শেলাই করে পাল।
        রাত কাটাব ঐখানেতেই করব বাঁধাবাড়া,
        এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া।
ভোর থাকতে কাক ডাক্‌তেই নৌকো দেব ছাড়ি,
ইটেখোলার মেলায় দেব সকাল সকাল পাড়ি॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# খাটুলি

একলা হোথায় বসে আছে, কেইবা জানে ওকে,
আপন-ভোলা সহজতৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে
টানছে তামাক ব'সে আপন মনে।
মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী
বইছে নিরবধি।
আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে,
আমের কাঠের নড়্‌নোড়ে এক তক্তপোষের পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের শেলাই-করা কাঁথা।
নাৎনি গেছে, রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে,
তেম্‌নি কচি গলায় ওকে দাদু বলেই ডাকে।
ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
দুঃখ অনেক পেয়েছে ও, হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।
বাইরে দারিদ্র্যের
কাটা ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
তবুও তার ভিতর মনে দাগ পড়ে না বেশি,
প্রাণটা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন মাংসপেশী।
হয়তো গোরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে দু'বার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে ;
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ঐ বছরের শেষে ;

শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে।

বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক,
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক'রে নেইকো এমন বাক্।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন করে পায় না ভেবে শেষে।

খাটুলিতে এসে বসে যখনি পায় ছুটি,
ভাবনাগুলো ধোঁয়ায় মেলায়, ধোঁয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলো-ছায়ার নাচে,
নদীব ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,
চক্ষু ভোলায় ক্ষেতের ফসল রঙের হরির লুটে,—
জন্মমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন
অতি সহজ বলেই তাহা জানে না ওর মন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# ঘরের খেয়া

সন্ধ্যা হয়ে আসে ;
সোনা-মিশোল্ ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।

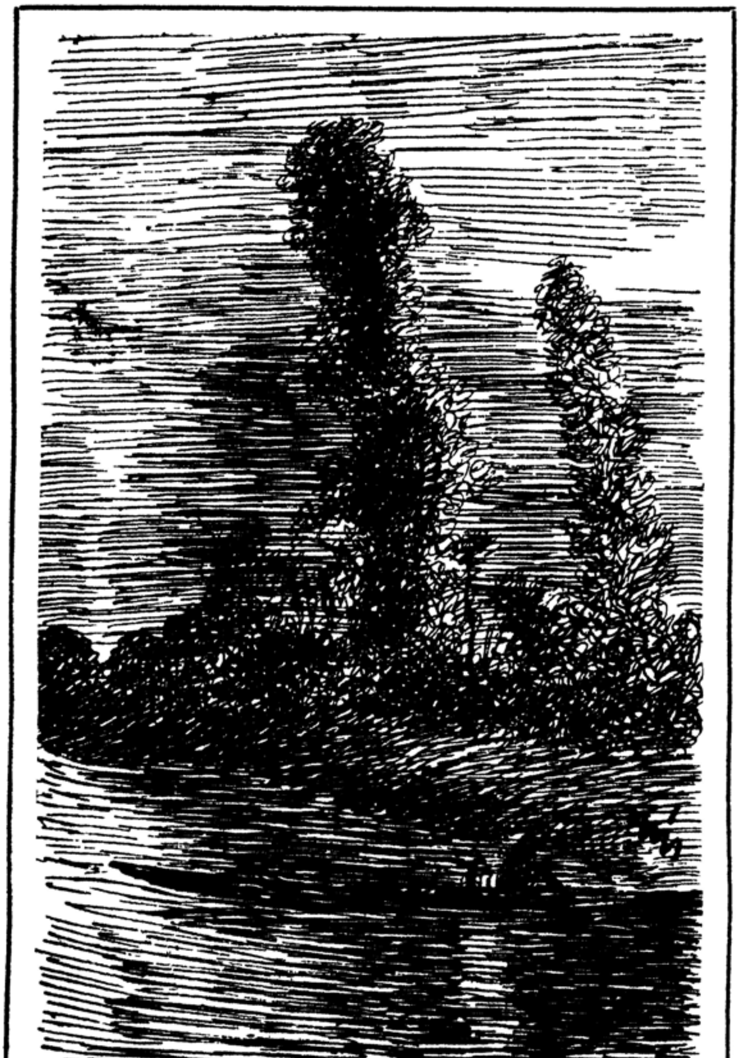

নৌকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।
আপন গাঁয়ে কুটীর আমার দূরের পটে লেখা,
ঝাপ্‌সা আভায় যাচ্ছে দেখা বেগ্‌নি রঙের রেখা।
যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।
হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে,
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের খবর জানে।
শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, শেষ হোলো জল-ঢালা,
আকাশতলে শুরু হোলো শুভ্র আলোর পালা।
ক্ষেতের পরে ক্ষেত একাকার প্লাবনে রয় ডুবে,
লাগল জলের দোলযাত্রা পশ্চিমে আর পুবে।
আসন্ন এই আঁধার মুখে নৌকোখানি বেয়ে
যায় কারা ঐ, শুধাই, ওগো নেয়ে,
চলেছ কোন্‌খানে।
যেতে যেতে জবাব দিল, যাব গাঁয়ের পানে।
অচিন শূন্যে ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়,
জানে বিজন মধ্যে কোথায় আপন জনের ভিড়।
অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে,
ঐ অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে।
তেমনি ওরা ঘরের পথিক ঘরের দিকে চলে
যেথায় ওদের তুলসিতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।
দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।
সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চল্‌ল গাঁয়ে॥

---

# যোগীন্‌দা

যোগীন দাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হোলো শিশু-দলের মাঝে।
জুলুম তোদের সইব না আর, হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চল্‌ত ঐ ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী,
ডেকে বলতেন কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোঁকি।
ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া,
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারি গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চারদিকে তাঁর ছোটোবড়ো জুটত যত লোভী,
কেউবা পেত মার্বেল, কেউ গণেশমার্কা ছবি।
কেউবা লজঞ্জুস,
সেটা ছিল মজলিসে তাঁর হাজ্‌রি দেবার ঘুষ।
কাজ্‌লি যদি অকারণে করত অভিমান,
হেসে বলতেন, হাঁ করো তো, দিতেন ছাঁচি পান।
আপনসৃষ্ট নাৎনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি,
পাগ্‌লি ছিল, পট্‌লি ছিল, আর ছিল জঙ্গুলি।
কেয়া খয়ের এনে দিত, দিত কাসুন্দিও,
মায়ের হাতের জারকলেবু যোগীন দাদার প্রিয়।

তখনো তাঁর শক্ত ছিল মুগুর-ভাঁজা দেহ,
বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে বুঝত না তা কেহ।
ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, চোখদুটি জ্বলজ্বলে,
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয়নি সে থল্‌থলে।



Imp. 4006, dt. 4.9.09

চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁফ জোড়াটার খ্যাতি ছিল, তাই নিয়ে তাঁর জাঁক।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি',
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্তশিষ্ট হয়ে
কাঁসর ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্‌ট্রিকের হয়নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া, আঁধার বাড়ত ক্রমে,
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।
সুরু হোলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক,
সত্যি মিথ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।
ভূগোল হোত উল্‌টো পাল্‌টা, কাহিনী আজগুবি,
মজা লাগত খুবি।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রংটুকু মন আমাদের ছাইত।

হুশিয়ারপুর পেরিয়ে গেল ছন্দোসির গাড়ি,
দেড়টা রাতে সরহবোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি।
ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার
বুলন্দশর আম্লোরিসর্সার।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায়ভরা পকৌড়ি আর চল্‌ছে মটরভাজা
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো সাতশো লোক লস্কর, বিশ পঁচিশটা হাতি,
মাথার উপর ঝালর দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।

মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ,
বল্‌লে, যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে, প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে।
বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।—

ব্যাপারখানা এই ঃ—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সদ্য ক'রে বিয়ে,
নাথ্‌দোয়ারার সেগুন বনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল, খুঁজে না পায় লোক।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হোলো রানীমায়ের চোখ।
খোঁজ পড়ে যায়, যেম্‌নি কিছু শোনে কানাঘুষায়,
খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে
গুলজারপুর হয়নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চঙ্গামঙ্গা দেখে, এল সবাই আলমগিরে,
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে।

ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাৎরাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া,—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর,—
জোড় হাতে কয়, রাজা সাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর।
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জম্‌কালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনাল সন্দেহ,
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর কেহ।

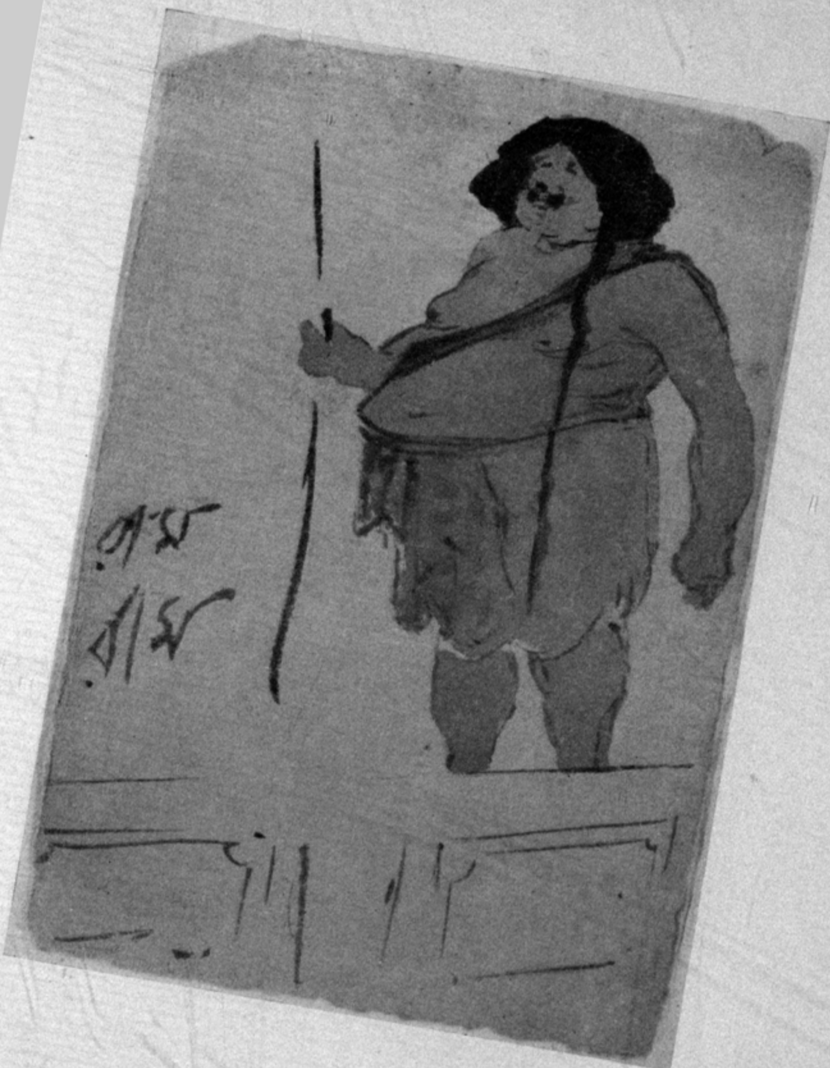

রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়
ওরে বাস্‌রে, দেখেনি সে আর কোনো জায়গায়।

তার পরে মাস পাঁচেক গেছে দুঃখে সুখে কেটে,
হারাধনের খবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা,
কেমন করে কী যে হোলো লাগল বিষম ধাঁধা।
গুর্খা ফৌজ সেলাম ক'রে দাঁড়াল চারদিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিখে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটার্সিতে
দেয় কারা সব জয়ধ্বনি উর্দু'তে ফার্সিতে।
সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছ্‌মন্ ঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ূরপংখি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পঁচিশটা কাহার
সঙ্গে চলল তাঁহার।
ভাটিণ্ডাতে দাঁড় করিয়ে জোরালো দূর্‌বীনে
দখিন মুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে
বিন্ধ্যাচলের পর্বত।
সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের সবৎ।
সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে
পড়ন্ত রোদ্দুরে।

এইখানেতেই শেষে
যোগীন দাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে।
হেসে বললেন, কী আর বলব, দাদা,
মাঝের থেকে মটর ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।
ও হবে না, ও হবে না বিষম কলরবে
ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল, শেষ করতেই হবে।

যোগীনদা কয়, যাক গে,
বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে।
তিনটে দিন না যেতে যেতেই হলেম গলদ্‌ঘর্ম।
রাজপুত্র হওয়া কি ভাই যে-সে লোকের কর্ম।
মোটা মোটা পরোটা আর তিন পোয়াটাক্‌ ঘি
বাংলা দেশের হাওয়ায় মানুষ সইতে পারে কি।
নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা,
এগুলি কি সহ্য করা সোজা।
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি বলেই করলে না সন্দেহ।
যেদিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা
পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।
সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে।
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা,
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু গুজব শুনতে পেলেম শেষে
কানে মোচড় খেয়ে টাকা ফেরৎ দিয়েছে সে।

কেন তুমি ফিরে এলে, চেঁচাই চারিপাশে,
যোগীন দাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলেম, আধেক রাত্রি ধরে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারতভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে,
যোগীন দাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

---

## বুধু

মাঠের শেষে গ্রাম,
সাতপুরিয়া নাম।
চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে,
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে।

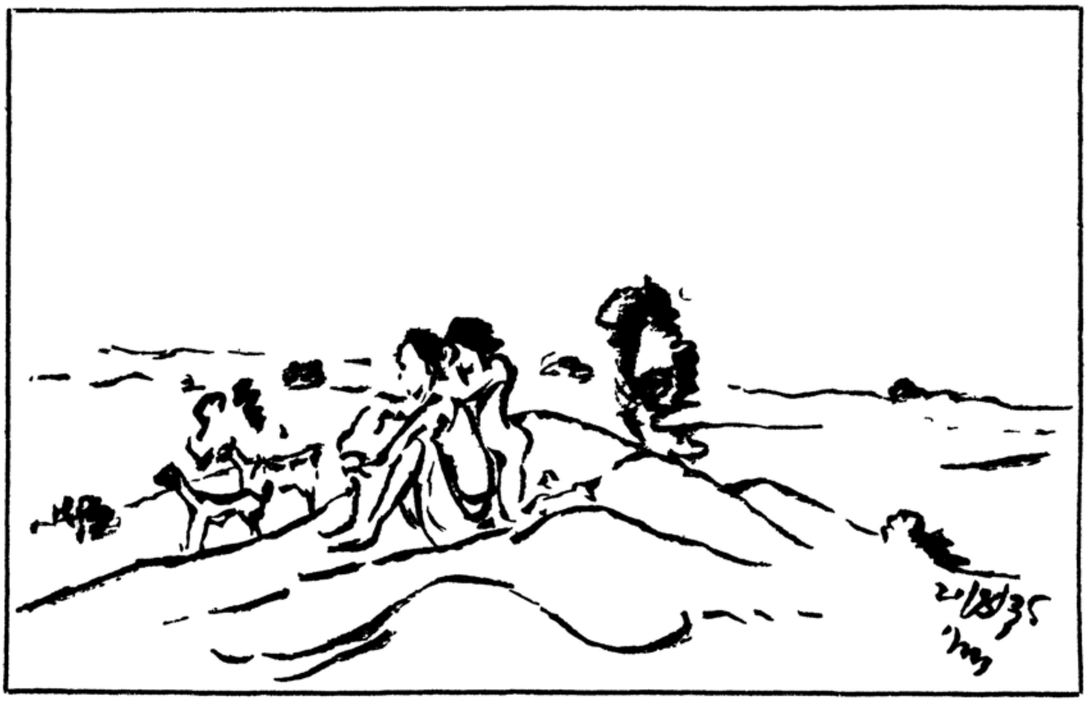

নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তর্মুজে।
ঐখানেতে বালির ডাঙা, মাঠ করছে ধু ধু,
ঢিবির পরে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বুধু।

সামনে মাঠে ছাগল চরছে ক'টা,
শুকনো জমি নেইকো ঘাসের ঘটা।
কী যে ওরা পাচ্ছে খেতে ওরাই সেটা জানে
ছাগল ব'লেই বেঁচে আছে প্রাণে।
আকাশে আজ হিমের আভাস, ফ্যাকাশে তার নীল,
অনেক দূরে যাচ্ছে উড়ে চিল।
হেমন্তের এই রোদ্দুরটা লাগছে অতি মিঠে,
ছোটো নাতি মোগ্‌লুটা তার জড়িয়ে আছে পিঠে।
স্পর্শপুলক লাগছে দেহে, মনে লাগছে ভয়
বেঁচে থাকলে হয়।
গুটি তিনটি মরে শেষে ঐটি সাধের নাতি
রাত্রিদিনের সাথী।
গোরুর গাড়ির ব্যবসা বুধুর চলছে হেসে খেলেই,
নাড়ী ছেঁড়ে এক পয়সা খরচ করতে গেলেই।
কৃপণ ব'লে গ্রামে গ্রামে বুধুর নিন্দে রটে,
সকালে কেউ নাম করে না উপোস পাছে ঘটে।
ওর যে কৃপণতা সে তো ঢেলে দেবার তরে,
যত কিছু জমাচ্ছে, সব মোগ্‌লু নাতির পরে।
পয়সাটা তার বুকের রক্ত, কারণটা তার ঐ,
এক পয়সা আর কারো নয় ঐ ছেলেটার বই।
না খেয়ে না প'রে নিজের শোষণ ক'রে প্রাণ
যেটুকু রয় সেইটুকু ওর প্রতি দিনের দান।
দেব্‌তা পাছে ঈর্ষাভরে নেয় কেড়ে মোগ্‌লুকে,
আঁকড়ে রাখে বুকে।
এখনো তাই নাম দেয়নি, ডাক নামেতেই ডাকে,
নাম ভাঁড়িয়ে ফাঁকি দেবে নিষ্ঠুর দেব্‌তাকে॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# চড়িভাতি

ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে ;
অফুরন্ত আতিথ্যে তাব সকালে বৈকালে
বন-ভোজনে পাখিরা সব আসছে ঝাঁকে ঝাঁক।
মাঠের ধারে আমার ছিল চড়িভাতিব ডাক।
যে যার আপন ভাঁড়াব থেকে যা পেল যেইখানে
মালমসলা নানারকম জুটিয়ে সবাই আনে।
জাত-বেজাতের চালে ডালে মিশোল ক'রে শেষে
ডুমুর গাছেব তলাটাতে মিলল সবাই এসে।

বারে বারে ঘটি ভ'রে জল তুলে কেউ আনে,
কেউ চলেছে কাঠের খোঁজে আম বাগানের পানে।
হাঁসের ডিমের সন্ধানে কেউ গেল গাঁয়ের মাঝে,
তিন কন্যা লেগে গেল রান্নাকরার কাজে।
গাঁঠ-পাকানো শিকড়েতে মাথাটা তার থুয়ে
কেউ পড়ে যায় গল্পের বই জামের তলায় শুয়ে।
সকল কর্ম-ভোলা
দিনটা যেন ছুটির নৌকা বাঁধন-রশি খোলা
চলে যাচ্ছে আপনি ভেসে সে কোন্ আঘাটায়
যথেচ্ছ ভাঁটায়।
মানুষ যখন পাকা ক'রে প্রাচীর তোলে নাই,
মাঠে বনে শৈলগুহায় যখন তাহার ঠাঁই,
সেইদিনকার আল্‌গা-বিধির বাইরে-ঘোরা প্রাণ
মাঝে মাঝে রক্তে আজো লাগায় মন্ত্রগান।
সেইদিনকার যথেচ্ছ-রস আস্বাদনের খোঁজে
মিলেছিলেম অবেলাতে অনিয়মের ভোজে।
কারো কোনো স্বত্বদাবীর নেই যেখানে চিহ্ন,
যেখানে এই ধরাতলের সহজ দাক্ষিণ্য,
হাল্‌কা সাদা মেঘের নিচে পুরানো সেই ঘাসে,
একটা দিনের পরিচিত আমবাগানের পাশে,
মাঠেব ধাবে, অনভ্যাসেব সেবার কাজে খেটে
কেমন করে কয়টা প্রহর কোথায় গেল কেটে।
সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু দুটি,
আশে পাশে এঁটোর লোভে কাক এল সব জুটি ;

গাঁয়ের থেকে কুকুর এল, লড়াই গেল বেধে,
একটা তাদের পালালো তার পরাভবের খেদে।

রৌদ্র পড়ে এল ক্রমে, ছায়া পড়ল বেঁকে,
ক্লান্ত গোরু গাড়ি টেনে চলেছে হাট থেকে।
আবার ধীরে ধীরে
নিয়ম-বাঁধা যে-যার ঘরে চলে গেলেম ফিরে।
একটা দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,
পোড়া কাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি।

আষাঢ়,
১৩৪৪

# কাশী

কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীন দাদার কাছে,
পষ্ট মনে আছে।
আমরা তখন ছিলাম না কেউ, বয়েস তাঁহার সবে
বছর আষ্টেক হবে।

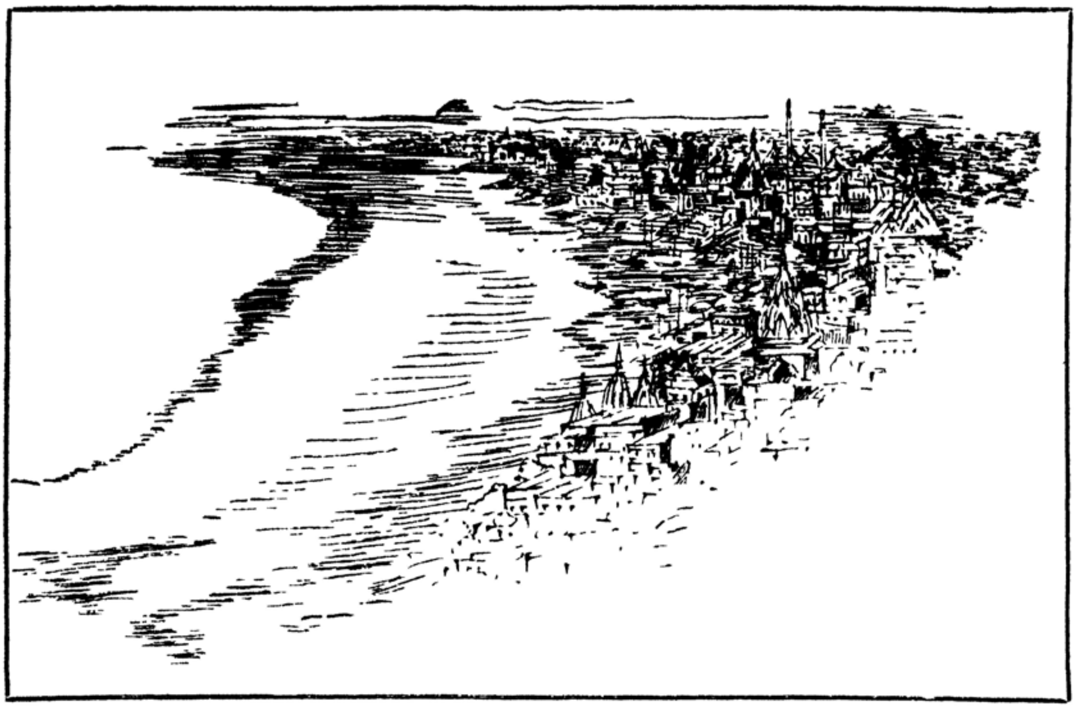

সঙ্গে ছিলেন খুড়ি,
মোরব্বা বানাবার কাজে ছিল না তাঁর জুড়ি।
দাদা বলেন, আম্‌লকি বেল পেঁপে সে তো আছেই,
এমন কোনো ফল ছিল না এমন কোনো গাছেই

তাঁর হাতে রস জমলে লোকের গোল না ঠেক্‌ত, এটাই
ফল হবে কি মেঠাই।
রসিয়ে নিয়ে চালতা যদি মুখে দিতেন গুঁজি'
মনে হোত বড়ো রকম রসগোল্লাই বুঝি।
কাঁঠাল বিচির মোরব্বা যা বানিয়ে দিতেন তিনি
পিঠে ব'লে পৌষমাসে সবাই নিত কিনি'।
দাদা বলেন, মোরব্বাটা হয়তো মিছে মিছিই,
কিন্তু মুখে দিতে যদি, বলতে কাঁঠাল বিচিই।
মোরব্বাতে ব্যবসা গেল জ'মে,
বেশ কিঞ্চিৎ টাকা জম্‌ল ক্রমে।
একদিন এক চোর এসেছে তখন অনেক রাত,
জানলা দিয়ে সাবধানে সে বাড়িয়ে দিল হাত।
খুড়ি তখন চাট্‌নি করতে তেল নিচ্ছেন মেপে,
ধড়াস করে চোরের হাতে জানলা দিলেন চেপে।
চোর বললে, উহু উহু, খুড়ি বললেন, আহা,
বা হাত মাত্র, এইখানেতেই থেকে যাক না তাহা।
কেঁদে কেটে কোনোমতে চোর তো পেল খালাস,
খুড়ি বললেন, মরবি, যদি এ ব্যবসা তোর চালাস্‌।

দাদা বললেন, চোর পালাল, এখন গল্প থামাই,
ছ'দিন হয়নি ক্ষৌর করা, এবার গিয়ে কামাই।
আমরা টেনে বসাই, বলি, গল্প কেন ছাড়বে,
দাদা বলেন, রবার না কি, টানলেই কি বাড়বে।
কে ফেরাতে পারে তোদের আবদারের এই জোর,
তার চেয়ে যে অনেক সহজ ফেরানো সেই চোর।
আচ্ছা তবে শোন্‌, সে মাসে গ্রহণ লাগল চাঁদে,
শহর যেন ঘিরল নিবিড় মানুষ-বোনা ফাঁদে।

খুড়ি গেছেন স্নান করতে বাড়ির দ্বারের পাশে,
আমার তখন পূর্ণগ্রহণ ভিড়ের রাহুগ্রাসে।
প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, মরছি যখন ডরে,
গুণ্ডা এসে তুলে নিল হঠাৎ কাঁধের পরে।

তখন মনে হোলো এ তো বিষ্ণুদূতের দয়া,
আর একটুকু দেরি হোলেই প্রাপ্ত হতেম গয়া।
বিষ্ণুদূতটা ধরল যখন যমদূতের মূর্তি
এক নিমেষেই একেবারেই ঘুচল আমার ফুর্তি।
সাতগলি সে পেরিয়ে শেষে একটা এঁধোঘরে
বসিয়ে আমায় রেখে দিল খড়ের আঁঠির পরে।
চোদ্দ আনা পয়সা আছে পকেট দেখি ঝেড়ে,
কেঁদে কইলাম, ও পাঁড়েজি, এই নিয়ে দাও ছেড়ে।
গুণ্ডা বলে, ওটা নেব, ওটা ভালো দ্রব্যই,
আরো নেব চারটি হাজার নয়শো নিরেনব্বই,—
তার উপরে আর দু আনা, খুড়িটা তো মরবে,
টাকার বোঝা বয়ে সে কি বৈতরণী তরবে।
দেয় যদি তো দিক চুকিয়ে, নইলে—পাকিয়ে চোখ
যে ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিলে সেটা মারাত্মক।

এমন সময়, ভাগ্যি ভালো, গুণ্ডাজির এক ভাগ্নি
মূর্তিটা তার রণচণ্ডী, যেন সে রায়-বাঘ্‌নি,
আমাব মবণ দশার মধ্যে হলেন সমাগত
দাবানলের ঊর্ধ্বে যেন কালো মেঘের মতো।
রাত্তিরে কাল ঘরে আমার উঁকি মারল বুঝি,
যেমনি দেখা অমনি আমি রইনু চক্ষু বুজি'।
পরের দিনে পাশের ঘরে—কী গলা তার বাপ্‌—
মামার সঙ্গে ঠাণ্ডা ভাষায় নয় সে বাক্যালাপ।
বলছে, তোমার মবণ হয় না, কাহার বাছনি ও
পাপের বোঝা বাড়িয়ো না আর, ঘরে ফেরৎ দিয়ো,—
আহা, এমন সোনার টুকরো,—শুনে আগুন মামা
বিশ্রী রকম গাল দিয়ে কয়, মিহি সুরটা থামা।

এ'কেই বলে মিহি সুর কি—আমি ভাবছি শুনে।
দিন তো গেল কোনোমতে কড়ি বর্‌গা গুনে'।
রাত্রি হবে দুপুর. ভাগ্নি ঢুক্‌ল ঘরে ধীরে,
চুপি চুপি বললে কানে, যেতে কি চাস ফিরে।
লাফিয়ে উঠে কেঁদে বললেম, যাব যাব যাব,
ভাগ্নি বল্‌লে, আমার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নাব,
কোথায় তোমার খুড়ির বাসা অগস্ত্যকুণ্ডে কি,
যে করে হোক আজকে রাতেই খুঁজে একবার দেখি ;
কালকে মামার হাতে আমার হবেই মুণ্ডপাত।
আমি তো ভাই বেঁচে গেলেম, ফরিয়ে গেল রাত।

হেসে বললেম, যোগীন দাদার গম্ভীর মুখ দেখে,
ঠিক এমনি গল্প, বাবা শুনিয়েছে বই থেকে।
দাদা বললেন, বিধি যদি চুরি করেন নিজে
পরের গল্প, জানিনে ভাই, আমি করব কী যে॥

---

# প্রবাসে

বিদেশ-মুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা,
গ্রাম-ছাড়ানো পথের বাতাস সর্বদা দেয় ঠেলা।

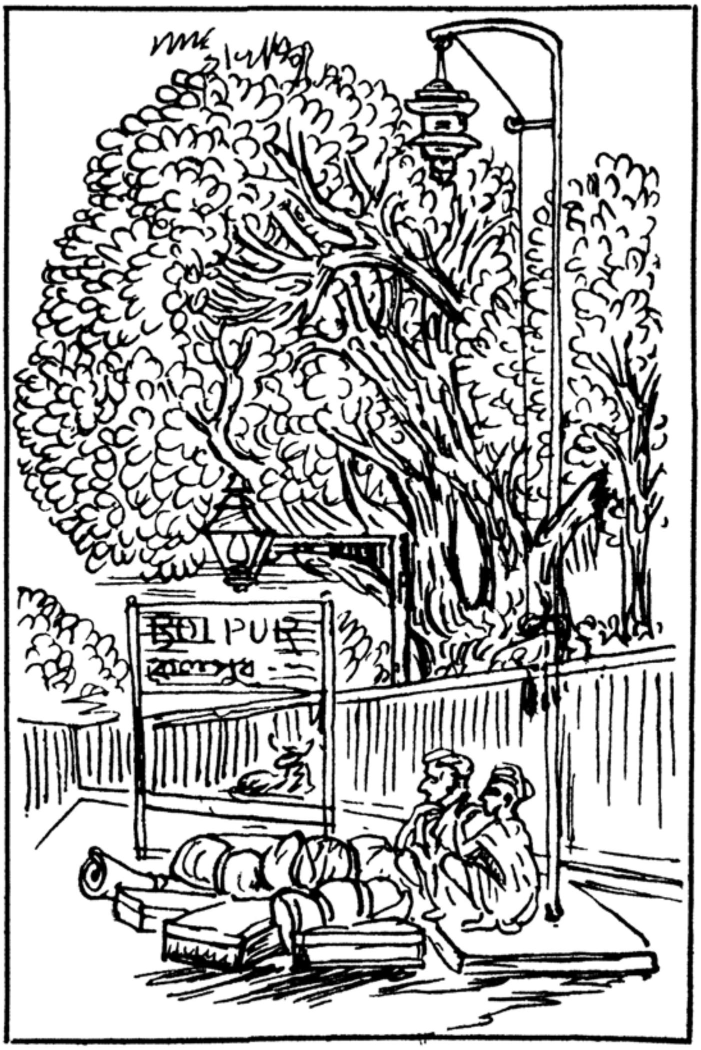

তাইতো সেদিন ছুটির দিনে টাইমটেবিল প'ড়ে
প্রাণটা উঠ্‌ল নড়ে।
বাক্সো নিলেম ভর্তি ক'রে, নিলেম ঝুলি থলে,
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চ'লে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ ক্ষেতের টানে
মনটা গেল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।
সামনে চেয়ে চেয়ে দেখি গম জোয়ারির ক্ষেতে
নবীন অঙ্কুরেতে
বাতাস কখন হঠাৎ এসে সোহাগ করে যায়
হাত বুলিয়ে কাঁচা শ্যামল কোমল কচি গায়।
আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সব্‌জি বাগানখানা
শুশ্রূষা পায় সারা দুপুর, জোড়া-বলদটানা
আঁকাবাঁকা কলকলানি করুণ জলের ধারায়,
চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভারে ভারায়।
ইঁদারাটার কাছে
বেগ্‌নি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে।
অনেক দূরে জলের রেখা চরের কূলে কূলে,
ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তুলে।
সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়
গ্রামটি দেখা যায়।
খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে
মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আম কাঁঠালের ছায়ে।
গোরুর গাড়ি পড়ে আছে মহানিমের তলে;
ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে
গম্ভীর ঔদাস্যে অলস আছে মহিষগুলি
এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি'।

বিকেলবেলায় একটুখানি কাজের অবকাশে
খোলা দ্বারের পাশে
দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার তরুণ মেয়ে
আপন মনে অকারণে বাহির পানে চেয়ে।
অশথতলায় বসে তাকাই ধেনু-চারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে।
মনে হোত চতুর্দিকে হিন্দি ভাষায় গাঁথা
একটা যেন সজীব পুঁথি, উল্‌টিয়ে যাই পাতা,
কিছু বা তার ছবি আঁকা কিছু বা তার লেখা,
কিছু বা তার আগেই যেন ছিল কখন্ শেখা।
ছন্দে তাহার রস পেয়েছি, আউড়িয়ে যায় মন,
সকল কথার অর্থ বোঝার নাইকো প্রয়োজন॥

আষাঢ়,
১৩৪৪

# পদ্মায়

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে,—
জানিনে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হাল্‌কা তুলির রেখা।
বালির পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,
তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল
ঘাটের কাছে, মাঠের ধারে, আলো ছায়ার স্রোতে ;
অলস দিনের উড়্‌নিখানার পরশ আকাশ হতে
বুলিয়ে যেত মায়ার মন্ত্র আমার দেহে মনে।
তারি মধ্যে আসত ক্ষণে ক্ষণে
দূর কোকিলের সুর
মধুর হোত আশ্বিনে রোদ্দুর।
পাশ দিয়ে সব নৌকো বড়ো বড়ো
পরদেশিয়া নানা ক্ষেতের ফসল ক'রে জড়ো
পশ্চিমে হাট বাজার হতে, জানিনে তার নাম,
পেরিয়ে আসত ধীর গমনে গ্রামের পরে গ্রাম
ঝপঝপিয়ে দাঁড়ে।
খোরাক কিনতে নামত দাঁড়ী ছায়ানিবিড় পাড়ে।
যখন হোত দিনের অবসান
গ্রামের ঘাটে বাজিয়ে মাদল গাইত হোলির গান।
ক্রমে রাত্রি নিবিড় হয়ে নৌকো ফেলত ঢেকে,
একটি কেবল দীপের আলো জ্বলত ভিতর থেকে।
শিকলে আর স্রোতে মিলে চলত টানের শব্দ ;
স্বপ্নে যেন ব'কে উঠত রজনী নিস্তব্ধ।

পুবে হাওয়ার এল ঋতু, আকাশ-জোড়া মেঘ,
ঘরমুখো ঐ নৌকোগুলোয় লাগল অধীর বেগ।
ইলিশ মাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,
কেনাবেচার ভিড় লাগল নৌকো-বাঁধা ঘাটে।
ডিঙি বেয়ে পাটের আঁঠি আনছে ভারেভারে;
মহাজনের দাঁড়ি পাল্লা উঠল নদীর ধারে।
হাতে পয়সা এল, চাষী ভাবনা নাহি মানে,
কিনে নতুন ছাতা জুতো চলেছে ঘরপানে।
পরদেশিয়া নৌকোগুলোর এল ফেরার দিন,
নিল ভরে খালি-করা কেরোসিনের টিন;
একটা পালের পরে ছোটো আরেকটা পাল তুলে
চলার বিপুল গর্বে তরীর বুক উঠেছে ফুলে।
মেঘ ডাক্‌ছে গুরু গুরু, থেমেছে দাঁড় বাওয়া,
ছুটছে ঘোলা জলের ধারা, বইছে বাদল হাওয়া॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।

উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিংপরে ডাক্‌ত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
তপ্‌সিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হোত তাঁর সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তাঁর শাড়িটি লাল পেড়ে।
চুরি করে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান্ উপদ্রবে।
কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হোলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাক্‌ত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাক্‌ত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছে হোত যদিই কোনো ছলে
ভর্তি হওয়া সহজ হোত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপ্‌ত না কো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।

ম্যাপে যে সব পাহাড় জানি, জানি যে সব গাং,
কুয়েনলুন্ আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াং,
জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানা রকম ধ্বনির সঙ্গে নানান্ চলাফেরা
সব দিয়ে এক হাল্‌কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

———

# দেশান্তরী

প্রাণধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের পরে,
আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশান্তরে।

দূর সহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে,
এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে
দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চল্‌ল ভাগ্যজয়ে,
মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে।
স্ত্রী দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে দু চোখ শুধু মোছে,
আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে।
ছেলে গেছে জাম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি,
মা তারে আজ ভুলে আছে তাই পেয়েছে ছুটি।
স্ত্রী বলেছে বারেবারে, যে করে হোক্ খেটে
সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে।
ঘর ছাইতে খড়ের আঁঠির জোগান দেবে সে যে,
গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে।
মাঠের থেকে খড়্‌কে কাঠি আনবে বেছে বেছে,
ঝাঁটা বেঁধে কুমোর টুলির হাটে আসবে বেচে।
ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে,
খুদ কুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে।
দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে
কোনোমতেই ভাবনা যেন না রয় স্বামীর মনে।
সময় হোলো, ঐ তো এল খেয়াঘাটের মাঝি,
দিন না যেতে রহিমগঞ্জে যেতেই হবে আজি।
সেইখানেতে চৌকিদারি করে ওদের জ্ঞাতি,
মহেশ খুড়োর মেঝো জামাই, নিতাই দাসেব নাতি।
নতুন নতুন গাঁ পেরিয়ে অজানা এই পথে,
পৌঁছবে পাঁচদিনের পরে শহর কোনোমতে।

সেইখানে কোন্ হাল্‌সিবাগান, ওদের গ্রামের কালো,
শর্ষে তেলের দোকান সেথায় চালাচ্ছে খুব ভালো।
গেলে সেথায় কালুর খবর সবাই বলে দেবে ;
তারপরে সব সহজ হবে, কী হবে আর ভেবে।
স্ত্রী বললে, কালুদাকে খবরটা এই দিয়ো
ওদের গাঁয়েব বাদল পালেব জ্যাঠতুত ভাই প্রিয়
বিয়ে করতে আসবে আমার ভাইঝি মল্লিকাকে
উনত্রিশে বৈশাখে॥

শান্তিনিকেতন
আষাঢ়, ১৩৪৪

# অচলা বুড়ি

অচল বুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতি মধুর জরা।

ফ্‌লো ফুলো দুই চোখে তার, দুই গালে আর ঠোঁটে
উছলে-পড়া হৃদয় যেন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে।
পরিপুষ্ট অঙ্গটি তার, হাতের গড়ন মোটা,
কপালে দুই ভুরুর মাঝে উল্‌কি-আঁকা ফোঁটা।
গাড়ি-চাপা কুকুর একটা মরতেছিল পথে
সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তারে তুলল কোনোমতে।
খোঁড়া কুকুর সেই ছিল তার নিত্যসহচর,
আধপাগলি ঝি ছিল এক, বাড়ি বালেশ্বর।
দাদাঠাকুর বলত, বুড়ি জমল কত টাকা,
সঙ্গে ওটা যাবে না তো বাক্সে রইল ঢাকা,
ব্রাহ্মণে দান করতে না চাও না হয় দাও না ধার,
জানোই তো এই অসময়ে টাকার কী দরকার।
বুড়ি হেসে বলে, ঠাকুর, দরকার তো আছেই,
সেইজন্যে ধার না দিয়ে রাখি টাকা কাছেই।

সাঁৎবাপাড়ার কায়েৎবাড়ির বিধবা এক মেয়ে,
এক কালে সে সুখে ছিল বাপের আদর পেয়ে।
বাপ মরেছে, স্বামী গেছে, ভাইরা না দেয় ঠাঁই,
দিন চালাবে এমনতরো উপায় কিছু নাই।
শেষকালে সে ক্ষুধার দায়ে, দৈন্যদশার লাজে
চলে গেল হাঁসপাতালে রোগিসেবার কাজে।
এর পিছনে বুড়ি ছিল, আর ছিল লোক তার
কংসারি শীল বেনের ছেলে মুকুন্দ মোক্তার।
গ্রামের লোকে ছি ছি করে, জাতে ঠেলল তাকে,
একলা কেবল অচল বুড়ি আদব করে ডাকে।
সে বলে, তুই বেশ করেছিস যা বলুক না যেবা,
ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।

জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক,
রাই ডোম্‌নির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক,
পারবে না আজ যেতে। শুনে কোতলপুরের রাজা
বল্‌লে ওকে যে করে হোক দিতেই হবে সাজা।

মিশনরির স্কুলে প'ড়ে কম্পোজিটরের
কাজ শিখে সে শহরেতে আয় করেছে ঢের।
তাই হবে কি ছোটোলোকের ঘাড়-বাঁকানো চাল।
সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র, দিল মাখনলাল,
ডাক-লুঠের এক মোকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাতবছরের জেলে।
ছেলের নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি'
ডোম্‌নি গেল ভিন্‌ গাঁয়েতে পাততে নতুন বাড়ি।
পতি মাসে অচল বুড়ি দামোদরের পারে
মাসকাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত তারে।
যখন তাকে খোঁটা দিল গ্রামের শম্ভু পিসে
রাই ডোম্‌নির পরে তোমার এত দরদ কিসে ;
বুড়ি বললে, যারা ওকে দিল দুঃখরাশি
তাদের পাপের বোঝা আমি হাল্‌কা করে আসি।

পাতানো এক নাৎনি বুড়ির একজ্বরি জ্বরে
ভুগতেছিল স্বরূপগঞ্জে আপন শ্বশুর ঘরে।
মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তুলল দিন রাত্রি জেগে,
ফিরে এসে আপনি পড়ল রোগের ধাক্কা লেগে।
দিন ফুরল দেবতা শেষে ডেকে নিল তাকে,
এক আঘাতে মারল যেন সকল পল্লীটাকে॥
অবাক হোলো দাদাঠাকুর অবাক স্বরূপ কাকা,
ডোম্‌নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জমা টাকা।
জিনিস পত্র আর যা ছিল দিল পাগল ঝিকে,
সঁপে দিল তারি হাতে খোঁড়া কুকুরটিকে।
ঠাকুর বল্‌লে মাথা নেড়ে, অপাত্রে এই দান
পরলোকের হারালো পথ, ইহলোকের মান॥

শান্তিনিকেতন, ১৩৪৪

# সুখিয়া

গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম,
গোয়াল বাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।
গোরু-চরার প্রকাণ্ড ক্ষেত, নদীর ওপার চরে,
কলাই শুধ্ ছিটিয়ে দিত পলি জমির পরে।
জেগে উঠত চারা তারি, গজিয়ে উঠত ঘাস,
ধেনুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।
মাঠটা জুড়ে বাঁধা হোত বিশ পঞ্চাশ চালা,
জমৃত রাখাল ছেলেগুলোর মহোৎসবের পালা।
গোপাষ্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হোত দান,
গুরু ঠাকুর গা ডুবিয়ে দুধে করত স্নান।
তার থেকে সর ক্ষীর নবনী তৈরি হোত কত,
প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।

বছর তিনেক অনাবৃষ্টি এল মন্বন্তর,
শ্রাবণ মাসে শোণ নদীতে বান এল তারপর।
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা,
ধরণী চায় শূন্য পানে সীমার চিহ্নহারা।
ভেসে চলল গোরু বাছুর টান লাগল গাছে,
মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আঁকড়ে আছে।
বন্যা যখন নেমে গেল বৃষ্টি গেল থামি,
আকাশ জুড়ে দৈত্যে দেবের ঘুচল সে পাগলামি।—
শিউনন্দন দাঁড়াল তার শূন্য ভিটেয় এসে,
তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।
চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁজি,
মনে হোলো সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি।

ছেলেটা তার ভীষণ জোয়ান, সামরু বলে তাকে,
এক-গলা এই জলে-ডোবা সকল পাড়াটাকে
মথন করে ফিরে ফিরে, তিনটে গোরু নিয়ে
ঘরে এসে দেখলে, দুহাত চোখে ঢাকা দিয়ে
ইষ্টদেবকে স্মরণ ক'রে নড়ছে বাপের মুখ,
তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক :
বলে উঠল, দেবতাকে তোর কেন মরিস ডাকি,
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক্ আজো রইল বাকি,

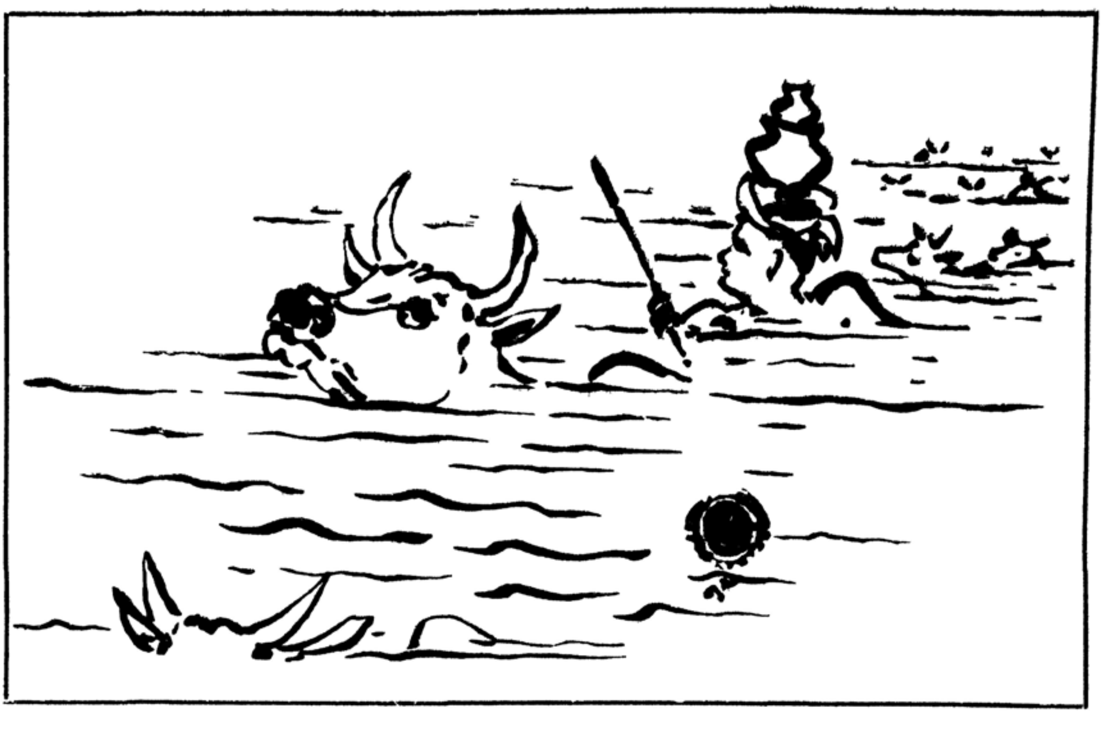

ভার নেব তার নিজেব পরেই, ঘটুক নাকো যা'ই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।

এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে
চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে
গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে.
মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।
ব্যব্‌সাটা ফের সুরু করল নেহাৎ গরিব চালে,
আশা রইল উঠবে জেগে আবার কোনো কালে।

এ দিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এগোয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনা পাওনা দিন রাত্রি জোয়ার ভাঁটা খেলে।
মাল তদন্ত করতে এল ছুনিয়াচাঁদ বেনে,
দশ বছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে।
ছেলেটা ওর জেদ ধরেছে ঐ সুধিয়া গাই,
পুষবে ঘরে আপন ক'রে ঐটে নেহাৎ চাই।
সামরু বলে তোমার ঘরে কী ধন আছে কত,
আমাদের এই সুধিয়াকে কিনে নেবার মতো।
ও যে আমার মানিক, আমার সাত রাজার ঐ ধন,
আর যা আমার যায় সবি যাক, দুঃখিত নয় মন।
মৃত্যুপারের থেকে ও যে ফিরেছে মোর কাছে,
এমন বন্ধু তিন ভুবনে আর কি আমার আছে।
বাপের কানে কী বললে সেই ছুনিচাঁদের ছেলে,
জেদ বেড়ে তার গেল বুঝি যেমনি বাধা পেলে।
শেঠজি বলে মাথা নেড়ে ছুই চারিমাস যেতেই
ঐ সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।

কালোয় সাদায় মিশোল বরন চিকন নধর দেহ,
সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত যেন রাশীকৃত স্নেহ।
আকাল এখন, সামরু নিজে দুইবেলা আধ-পেটা.
সুধিয়াকে খাওয়ানো চাই যখনি পায় যেটা।
দিনের কাজের অবসানে গোয়ালঘরে ঢুকে,
ব'কে যায় সে গাভীর কানে যা আসে তার মুখে।
কারো পরে রাগ সে জানায়, কখনো সাবধানে
গোপন খবর থাকলে কিছু জানায় কানে কানে।

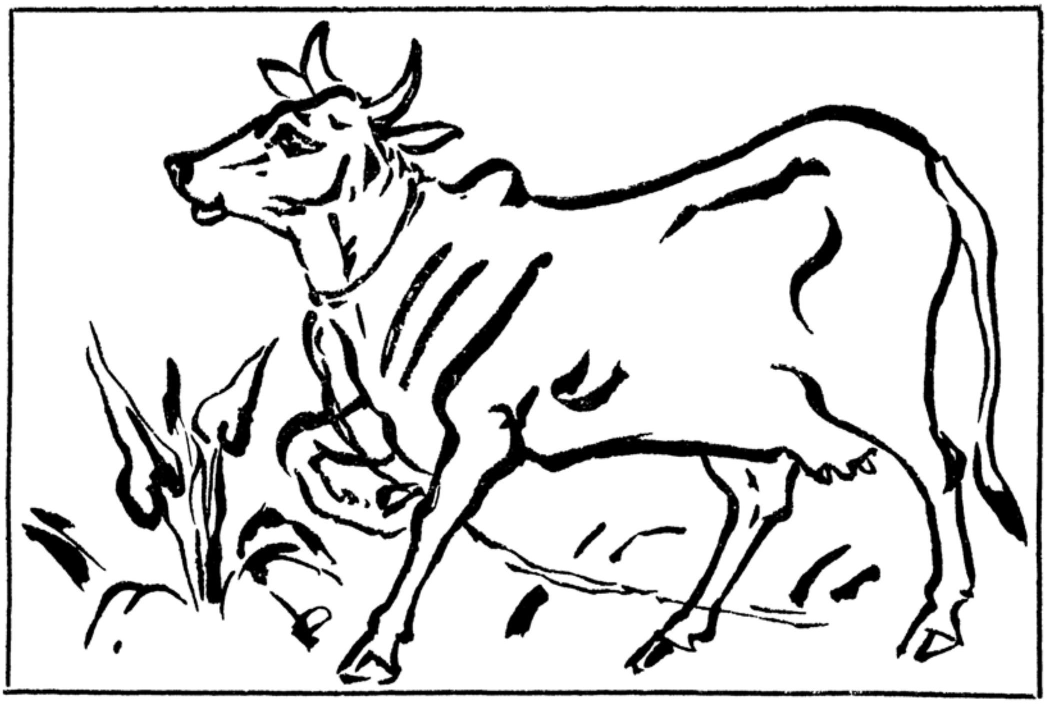

সুধিয়া সব দাঁড়িয়ে শোনে কানটা খাড়া করে,
বুঝি কেবল ধ্বনির সুখে মন ওঠে তার ভরে।

সামরু যখন ছোটো ছিল পালোয়ানের পেষা
ইচ্ছা করেছিল নিতে, ঐ ছিল তার নেশা।
খবর পেল নবাব বাড়ি কুস্তিগিরের দল,
পাল্লা দেবে, সামরু শুনে অসহ্য চঞ্চল।
বাপকে ব'লে গেল ছেলে, কথা দিচ্ছি শোনো,
এক হপ্তার বেশি দেরি হবে না কখ্‌খোনো।
ফিরে এসে দেখতে পেলে সুধিয়া তার গাই
শেঠ নিয়েছে ছলে বলে, গোয়ালঘরে নাই।
যেমনি শোনা অমনি ছুটল, ভোজালি তার হাতে,
দুনি চাঁদের গদি যেথায় নাজির মহল্লাতে।
কী রে সামরু, ব্যাপারটা কী, শেঠজি শুধায় তাকে।
সামরু বলে ফিরিয়ে নিতে এলুম সুধিয়াকে।
শেঠ বললে, পাগল না কি, ফিরিয়ে দেব তোরে,
পর্শু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে।
"সুধিয়ারে", "সুধিয়ারে" সামরু দিল হাঁক,
পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।
চেনা সুরের হাম্বা ধ্বনি কোথায় জেগে উঠে,
দড়ি ছিঁড়ে সুধিয়া ঐ হঠাৎ এল ছুটে।
দুচোখ বেয়ে ঝরছে বারি, অঙ্গটি তার রোগা,
অন্ন পানে দেয়নি সে মুখ, অনশনে ভোগা।
সামরু ধরল জড়িয়ে গলা, বললে "নাইরে ভয়,
আমি থাকতে দেখব এখন কে তোরে আর লয়।
তোমার টাকায় দুনিয়া কেনা, শেঠ দুনিচাঁদ, তবু
এই সুধিয়া একলা নিজের, আর কারো নয় কভু
আপন ইচ্ছামতে যদি তোমার ঘরে থাকে
তবে আমি এই মুহূর্তে রেখে যাব তাকে।"

চোখ পাকিয়ে কয় চুনিচাঁদ "পশুর আবার ইচ্ছে,
গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে।
গোল করো তো ডাকব পুলিশ"। সামরু বললে, "ডেকো,
ফাঁসি আমি ভয় করিনে এইটে মনে রেখো।
দশবছরের জেল খাটব, ফিরব তো তারপর,
সেই কথাটাই ভেব বসে, আমি চল্‌লেম ঘর॥"

শান্তিনিকেতন
আষাঢ়, ১৩৪৪

# মাধো

রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ.
সোনা রূপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত।
আপন বিদ্যা শিখিয়ে মানুষ করবে ছেলেটাকে
এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে ;
বসিয়ে রাখত চোখের সামনে, জোগান দেবার কাজে
লাগিয়ে দিত যখন তখন, আবার মাঝে মাঝে
ছোটো মেয়ের পুতুল খেলার গয়না গড়াবার
ফরমাসেতে খাটিয়ে নিত, আগুন ধরাবার
সোনা গলাবার কর্মে, একটুখানি ভুলে
চড় চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে।
সুযোগ পেলেই পালিয়ে বেড়ায় মাধো যে-কোন্‌খানে
ঘরের লোকে খুঁজে ফেরে বৃথাই সন্ধানে।
শহরতলির বাইরে আছে দিঘি সাবেককেলে
সেইখানে সে জোটায় যত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
গুলিডাণ্ডা খেলা ছিল, দোলনা ছিল গাছে,
জানা ছিল যেথায় যত ফলের বাগান আছে।
মাছ ধরবার ছিপ বানাত, সিসুডালের ছড়ি.
টাট্টু ঘোড়ার পিছে চড়ে ছোটাত দড়্‌বড়ি।
কুকুরটা তার সঙ্গে থাকত নাম ছিল তার বটু,
গিরগিটি আর কাঠবেড়ালি তাড়িয়ে ফেরায় পটু।
শালিখ পাখির মহলেতে মাধোর ছিল যশ,
ছাতুর গুলি ছড়িয়ে দিয়ে করত তাদের বশ।
বেগার দেওয়ার কাজে পাড়ায় ছিল না তার মতো,
বাপের শিক্ষানবিশিতেই কুঁড়েমি তার যত।

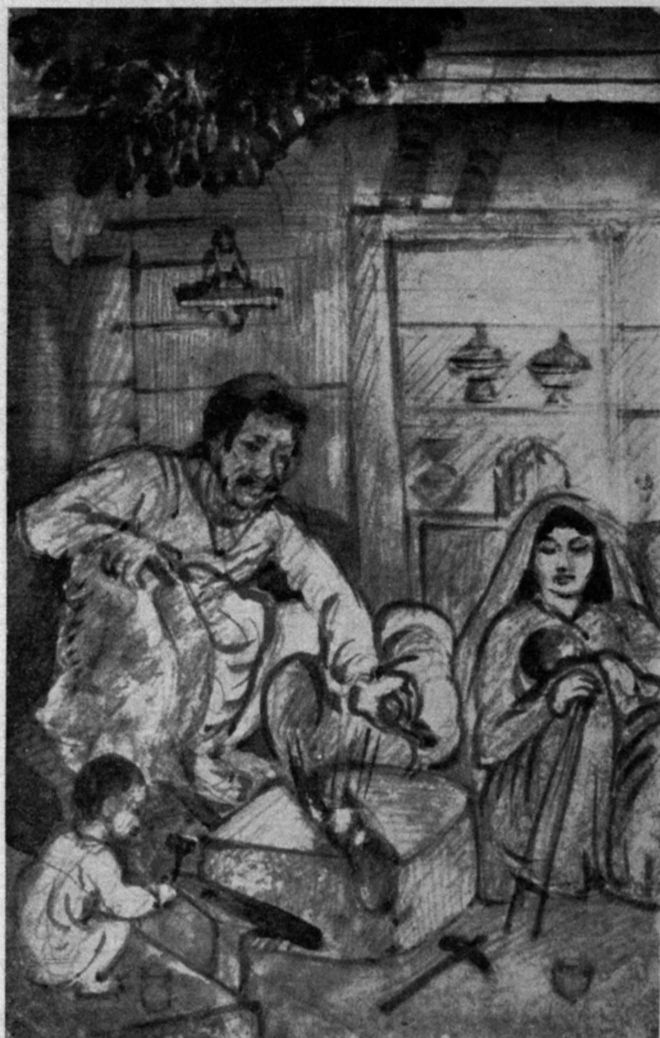

কিষনলালের ছেলে, তারে দুলাল ব'লে ডাকে,
পাড়াসুদ্ধ ভয় করে এই বাঁদর ছেলেটাকে।
বড়োলোকের ছেলে ব'লে গুমর ছিল মনে,
অত্যাচারে তারি প্রমাণ দিত সকলখনে।
যটুর হবে সাঁতারখেলা, বটু চলছে ঘাটে,
এসেছে যেই দুলাল চাঁদের গোলা খেলার মাঠে
অকারণে চাবুক নিয়ে দুলাল এল তেড়ে,
মাধো বললে, মারলে কুকুর ফেলব তোমায় পেড়ে।

উঁচিয়ে চাবুক দুলাল এল, মানল নাকো মানা,
চাবুক কেড়ে নিয়ে মাধো করলে দুতিনখানা।
দাড়িয়ে রইল মাধো, রাগে কাঁপছে থরো থরো,
বললে, দেখব সাধ্য তোমার, কী করবে তা করো।
দুলাল ছিল বিষম ভীতু, বেগ শুধু তার পায়ে,
নামের জোরেই জোর ছিল তার, জোর ছিল না গায়ে।

দশবিশজন লোক লাগিয়ে বাপ আনলে ধরে,
মাধোকে এক খাটের খুবোয় বাঁধল কষে জোরে।
বললে, জানিসনেকো বেটা, কাহার অন্ন খাবিস,
এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তুই মারিস।
আজ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে,
দুলাল স্বয়ং মারবে চাবুক, দেখবে সকল লোকে।

মনিববাড়ির পেয়াদা এল দিন হোলো যেই শেষ।
দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ।

মাকে শুধায়, এ কী কাণ্ড, মা শুনে কয়, নিজে
আপন হাতে বাঁধন তাহার আমিই খুলেছি যে ;
মাধো চাইল চলে যেতে, আমি বললেম যেয়ো,
এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও।
স্বামীর পরে হানল দৃষ্টি দারুণ অবজ্ঞার,
বললে, তোমার গোলামিতে ধিক্ সহস্রবার।

পেরোলো বিশ পঁচিশ বছর ; বাংলা দেশে গিয়ে
আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধো করল বিয়ে।
ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হোলো সে সংসারী,
কোন্খানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।
এমন সময় নরম যখন হোলো পাটের বাজার,
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর ; সাহেব দিল ডাক,
বললে, মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্।
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি যে মার খেয়ে,
মাধো বললে, মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।

শেষ পালাতে পুলিশ নামল, চলল গুঁতো গাঁতা,
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা।
মাধো বললে, সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।

চলল সেথায় যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে,
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হোলো ওরা ভরসা বুকে আঁটি',
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি॥

শ্রাবণ, ১৩৪৪

# আতার বিচি

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল
দেখব ব'লে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।

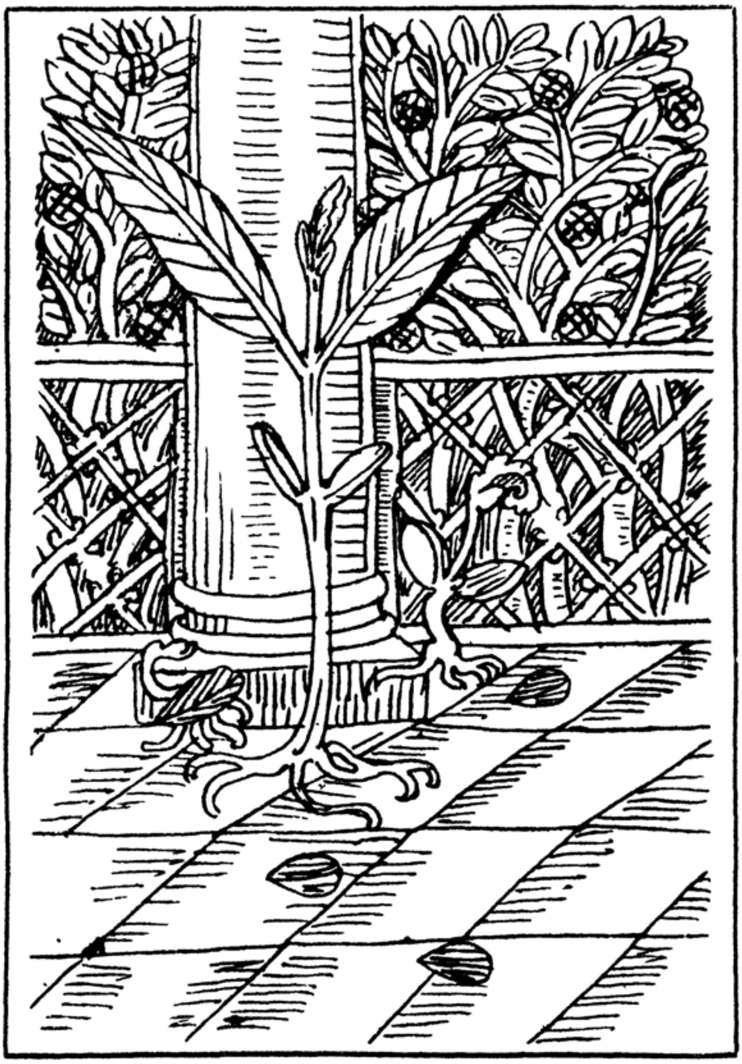

তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়।
দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলো বালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে,
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি রোজ ভোরে।
বারান্দাটার পূর্ব ধারে টেবিল ছিল পাতা,
সেইখানেতে পড়া চলত ; পুঁথিপত্র খাতা
রোজ সকালে উঠত জ'মে দুর্ভাবনার মতো ;
পড়া দিতেন, পড়া নিতেন মাস্টার মন্মথ।
পড়তে পড়তে বারে বারে চোখ যেত ঐ দিকে,
গোল হোত সব বানানেতে, ভুল হোত সব ঠিকে।
অধৈর্য অসহ্য হোত, খবর কে তার জানে
কেন আমার যাওয়া আসা ঐ কোণটার পানে।
দুমাস গেল, মনে আছে সেদিন শুক্রবার,
অঙ্কুরটি দেখা দিল নবীন সুকুমার।
অঙ্ক কষার বারান্দাতে, চুন সুরকির কোণে
অপূর্ব সে দেখা দিল, নাচ লাগাল মনে।
আমি তাকে নাম দিয়েছি আতা গাছের খুকু,
ক্ষণে ক্ষণে দেখতে যেতেম, বাড়ল কতটুকু।
দুদিন বাদেই শুকিয়ে যেত সময় হোলে তার,
এ জায়গাতে স্থান নাহি ওর করত আবিষ্কার ;
কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচি কচি পাতার কুঁড়ি হোলো খণ্ড খণ্ড,

আমার পড়ার ত্রুটির জন্যে দায়ী করলেন ওকে,
বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে।
দাদা বললেন, কী পাগলামি, শান-বাঁধানো মেঝে,
হেথায় আতার বীজ লাগানো ঘোর বোকামি এ যে।
আমি ভাবলুম সারা দিনটা বুকের ব্যথা নিয়ে
বড়োদের এই জোর খাটানো, অন্যায় নয় কি এ।
মূর্খ আমি ছেলেমানুষ, সত্য কথাই সে তো,
একটু সবুর করলেই তা আপনি ধরা যেত॥

শ্রাবণ, ১৩৪৪

# মাকাল

গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল,
জন্ম তাহার হয়েছিল, সেই যে বছর আকাল।

গুরুমশায় বলেন তারে—
"বুদ্ধি যে নেই একেবারে" ;
দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ'মাস ধরে নাকাল ;
রেগেমেগে বলেন, "বাঁদর, নাম দিনু তোর মাকাল ॥"

নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু ;
তারপর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু।
হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি'
সবাই তাকে শুধায় এ কী,
সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু,—
নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুরুদুরু ॥

কোলের পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে কানে,—
"গুরুমশায় গাল দিয়েছেন বুঝিসনে তার মানে !"
রাখাল বলে, "কখ্‌খোনো না,
মা যে আমায় বলেন সোনা,
সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে ;
আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব, চলো তো ঐখানে ॥"

টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুরপাড়ের কাছে,
বেড়ার 'পরে লতায় যেথা মাকাল ফ'লে আছে।
বলেন, "দাদা সত্যি বোলো,
সোনার চেয়ে মন্দ হোলো ?
তুমি শেষে বলতে কি চাও, গাল ফলেছে গাছে।"
"মাকাল আমি" ব'লে রাখাল দুহাত তুলে নাচে ॥

দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায়,
লেখাপড়ায় মন দেখে' মা অবাক হয়ে যায়।
খাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁকে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু—"মাকালচন্দ্র রায়॥"

৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৭

---

# পাথরপিণ্ড

সাগরতীরে পাথরপিণ্ড ঢুঁ মারতে চায় কা'কে,
বুঝি আকাশটাকে।
শান্ত আকাশ দেয় না কোনো জবাব,
পাথরটা রয় উঁচিয়ে মাথা, এমনি সে তার স্বভাব।

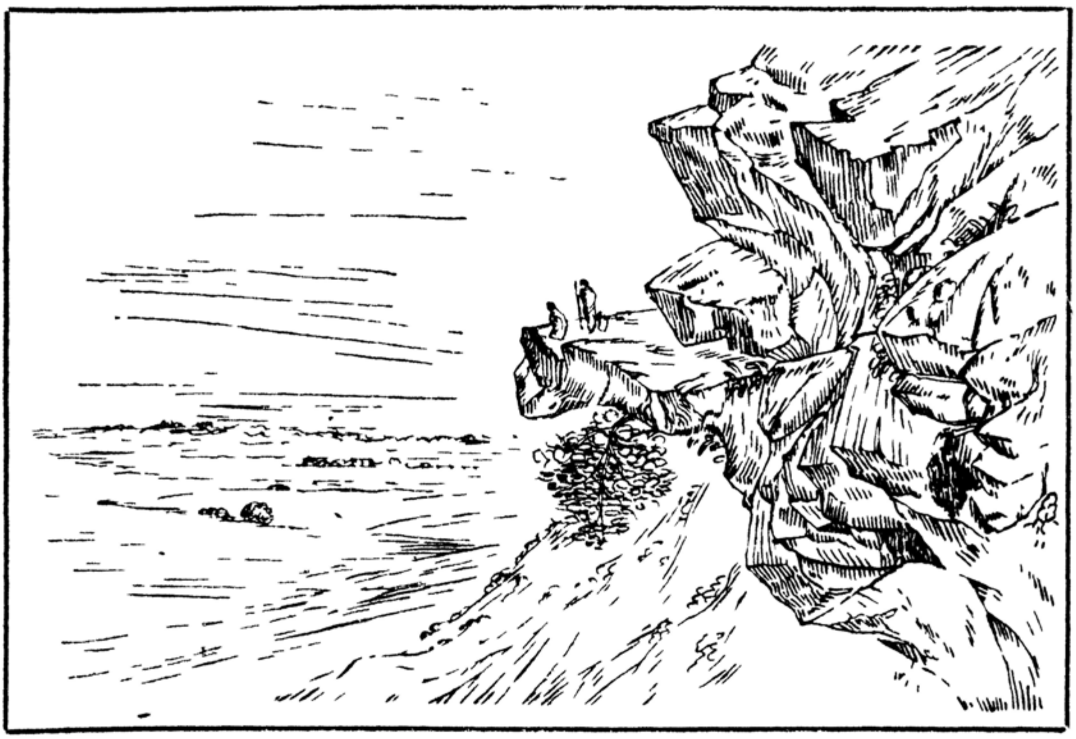

হাতের কাছেই আছে সমুদ্রটা,
অহংকারে তারি সঙ্গে লাগত যদি ওটা,
এমনি চাপড় খেত, তাহার ফলে
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে চুরে পড়ত অগাধ জলে।

ঢুঁ-মারা এই ভঙ্গীখানা কোটি বছর থেকে
ব্যঙ্গ ক'রে কপালে তার কে দিল ঐ এঁকে।
পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস বের করেছেন খুঁজি',
শুনি তাহা, কতক বুঝি, নাইবা কতক বুঝি।

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন পাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন টানে
আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।
লাগল কাহার শাপ,
হারাল তার ছুটোছুটি, হারাল তার তাপ।
দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে
আড়ষ্ট এক পাথর হয়ে কখন গেল জ'মে।
আজকে যে ওর অন্ধ নয়ন, কাতর হয়ে চায়
সম্মুখে কোন্ নিঠুর শূন্যতায়।
স্তম্ভিত চীৎকার সে যেন, যন্ত্রণা নির্বাক,
যে যুগ গেছে তার উদ্দেশে কণ্ঠহারার ডাক।
আগুন ছিল পাখায় যাহার আজ মাটি-পিঞ্জরে
কান পেতে সে আছে ঢেউয়ের তরল কলস্বরে।
শোনার লাগি ব্যগ্র তাহার ব্যর্থ বধিরতা
হেরে-যাওয়া সে যৌবনের ভুলে-যাওয়া কথা॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

---

# তালগাছ

বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে
গম্ভীরতায় আসর জমিয়ে আছে।
পরিতৃপ্ত মূর্তিটি তার তৃপ্ত চিকন পাতায়,
তুপুরবেলায় একটুখানি হাওয়া লাগছে মাথায়॥

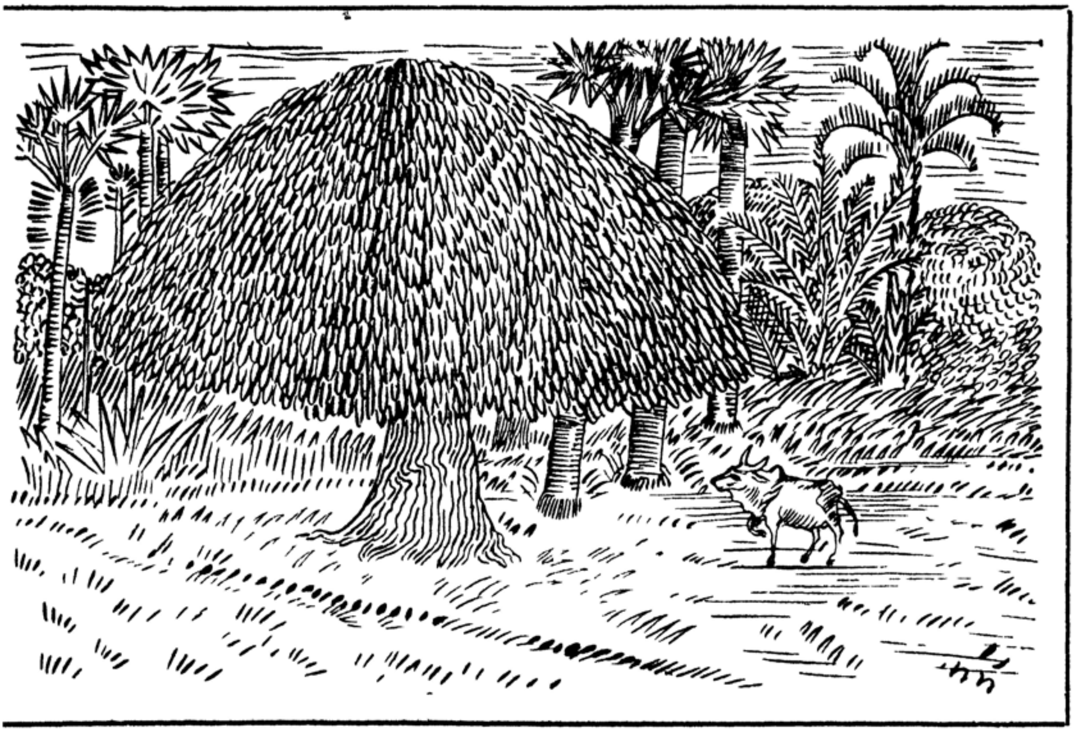

মাটির সঙ্গে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনাতে
সঙ্গিনী তার শ্যামল ছায়া, আঁচলখানি পাতে।

গোরু চরে রৌদ্রছায়ায় সারা প্রহর ধ'রে,
খাবার মতো ঘাস বেশি নেই, আরাম শুধুই চ'রে।
পেরিয়ে বেড়া ঐ যে তালের গাছ,
নীল গগনে ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে পাতার নাচ।
আশে পাশে তাকায় না সে, দূরে-চাওয়ার ভঙ্গী,
এমনিতরো ভাবটা যেন নয় সে মাটির সঙ্গী।
ছায়াতে না মেলায় ছায়া বসন্ত উৎসবে,
বায়না না দেয় পাখির গানের বনের গীতরবে।
তারার পানে তাকিয়ে কেবল কাটায় রাত্রিবেলা,
জোনাকিদের পরে যে তার গভীর অবহেলা।
উলঙ্গ সুদীর্ঘ দেহে সামান্য সম্বলে
তার যেন ঠাঁই ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীদের দলে॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# শনির দশা

আধবুড়ো ঐ মানুষটি মোর
নয় চেনা,
একলা বসে ভাবছে, কিংবা
ভাবছে না,
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই ভাবছি,
মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি।

বুঝিবা ওর মেঝো মেয়ে পাতা ছ'য়েক ব'কে
মাথাব দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে।
উমারানীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন,
জিদ ধরেছে, হোক না যেমন-করেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই।
আবেদনের পত্র একটি লিখে
পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবুটিকে।
বাবু বললে, হয় কখনো তা' কি,
মাসকাবারের ঝুড়িঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি,
সাহেব শুনলে আগুন হবে চ'টে,
ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে।
মেয়ের দুঃখ ভেবে
বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে।
সুবুদ্ধি তার কইল কানে রাগ গেল যেই থামি',
আসন্ন পেন্‌সনের আশা ছাড়াটা পাগলামি।
নিজেকে সে বললে, ওরে, এবার না হয় কিনিস
ছোটো ছেলের মনের মতো একটা কোনো জিনিস।

যেটার কথাই ভেবে দেখে দামের কথায় শেষে
বাধায় ঠেকে এসে।
শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি,
দেখলে খুশি হয়তো হবে উর্মি।

কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রূপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে তার কেবলি মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলে।
রোজ সে দেখে টাইম টেবিলখানা,
ক'দিন থেকে ইস্টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িটা তার প্রত্যহ হয় ফেল্।
চিন্তিত ওর মুখের ভাবটা দেখে
এমনি একটা ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।
কৌতূহলে শেষে
একটুখানি উসখুসিয়ে একটুখানি কেশে,
শুধাই তারে বসে তাহার কাছে,
কী ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।
বললে বুড়ো, কিচ্ছুই নয়, মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়,
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকা বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিন্‌ব টিকিট আজ কি।
আমি বললেম, কাজ কী।
রাগে বুড়োর গরম হোলো মাথা,
বললে, থামো ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা,
কেনার সময় রইবে না আর
আজিকার এই দিন বই,
কিনব আমি, কিনব আমি,
যে করে হোক কিনবই॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

[illegible]

# রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধাঁনো তাপে।
কোথাও কোনো শব্দ যে নেই তারি শব্দ বাজে
ঝা ঝা ক'রে সারা দুপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
দিগ্বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।
দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাখে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে,
নৌকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।
বর্ষা হোলে বন্যা নামে দূরের পাহাড় হতে
কূল হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার ; দমকা হাওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাবুক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই বৃষ্টি ধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে সুর মেশে না ধেনুর হাম্বারবে।

ক্ষেতের মধ্যে কলকলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্যাওলা পানার দল।
রাত্রি যখন ধ্যানে বসে তারাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না যে,
সমস্ত নিঃঝুম
জাগাও নেই কোনোখানে কোথাও নেই ঘুম॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# বাসা-বাড়ি

এই সহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি',
অজগবের ভূতের মতন গলির পরে গলি।

ধাঁধাঁ ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি পথের বাঁ দিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার মুখোস-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া,
হাঁ-করা মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দ সাড়া।

চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে করছে বসবাস,
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েকদিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায় কেই বা তাদের চিনে।
সুধাই আমি, আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই,
মনে হোলো, জবাব এল, আমরা নাই নাই।
সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
এক সঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই,
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, আমরা নাই নাই।
আমি সুধাই,—কিসের কাজে এসেছ এইখানে;
জবাব এল, সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদেব দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপবেতে চাপা দিয়ে যাই—
নাই, নাই, নাই।

পবের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকাল বেলা,
ছেলেবা সব পথে কবছে লড়াই লড়াই খেলা,

কাঠি হাতে দুই পক্ষের চল্‌ছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি,
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল্ জেতা হারা,
দেনা পাওনা জমতে থাকে হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসনমাজার,
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার আমরা নাই নাই॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# আকাশ

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।

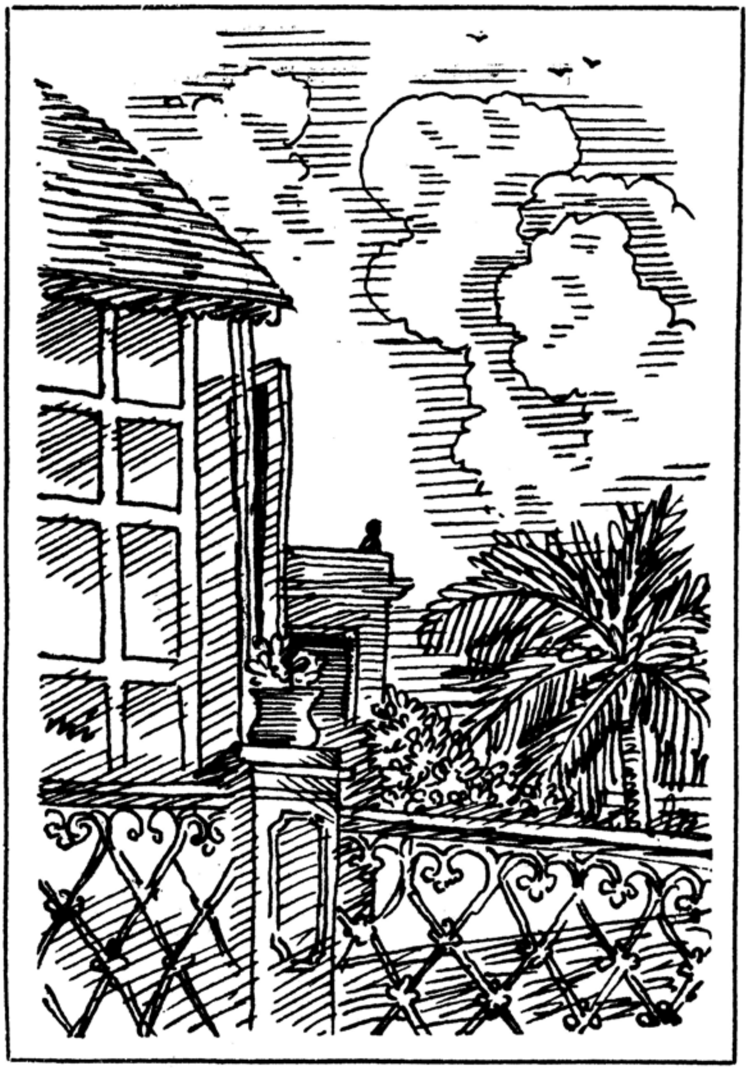

দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা ;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে
চুরি করতেম আকাশভরা সোনার বরন ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।
দুপুর রৌদ্রে সুদূর শূন্যে আর কোনো নেই পাখি,
কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি',
নীল অদৃশ্যপানে ;
আকাশ-প্রিয় পাখি ওকে আমার হৃদয় জানে।
স্তব্ধ ডানা প্রখর আলোর বুকে
যেন সে কোন্ যোগীর ধেয়ান মুক্তি-অভিমুখে।
তীক্ষ্ণ তীব্র সুর
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে দূরের হতে দূর
ভেদ করে যায় চ'লে।
বৈরাগী ঐ পাখির ভাষা মন কাঁপিয়ে তোলে।

আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
শুভ্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহন স্নানে।
আবার যখন ঝঞ্ঝা, যেন প্রকাণ্ড এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল,
দিকে দিকে ঝাপ্টে বেড়ায় স্পর্ধা-বেগের ডানা,
মানতে কোথাও চায় না কারো মানা,

বারে বারে তড়িৎশিখার চঞ্চু আঘাত হানে
অদৃশ্য কোন্ পিঞ্জরটার কালো নিষেধ পানে,
আকাশে আর ঝড়ে
আমার মনে সব-হারানো ছুটির মূর্তি গড়ে।
তাইতো খবর পাই
শান্তি সেও মুক্তি, আবার অশান্তিও তাই ॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

---

# খেলা

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।

বাতাসে তার ছেলেখেলা আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ্‌গদ ভাষ বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।
ঝরণা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথার থেকে পেলে।
ঐ হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা,
গম্ভীরতায় অটল যেমন, চঞ্চলতায় পাকা।
মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়,
ঝড়ের দিনে কী পাগলামি চাপে যে ওর মাথায়।
ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।
এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে।
রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো, দেখি সকাল বেলায়
চাদরটা ওর কাজে লাগে চাদরখোলার খেলায়।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি,
প্রকাণ্ড এক হাসি।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# ছবি-আঁকিয়ে

ছবি আঁকার মানুষ ও গো পথিক চিরকেলে,
চলছ তুমি আশে পাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।

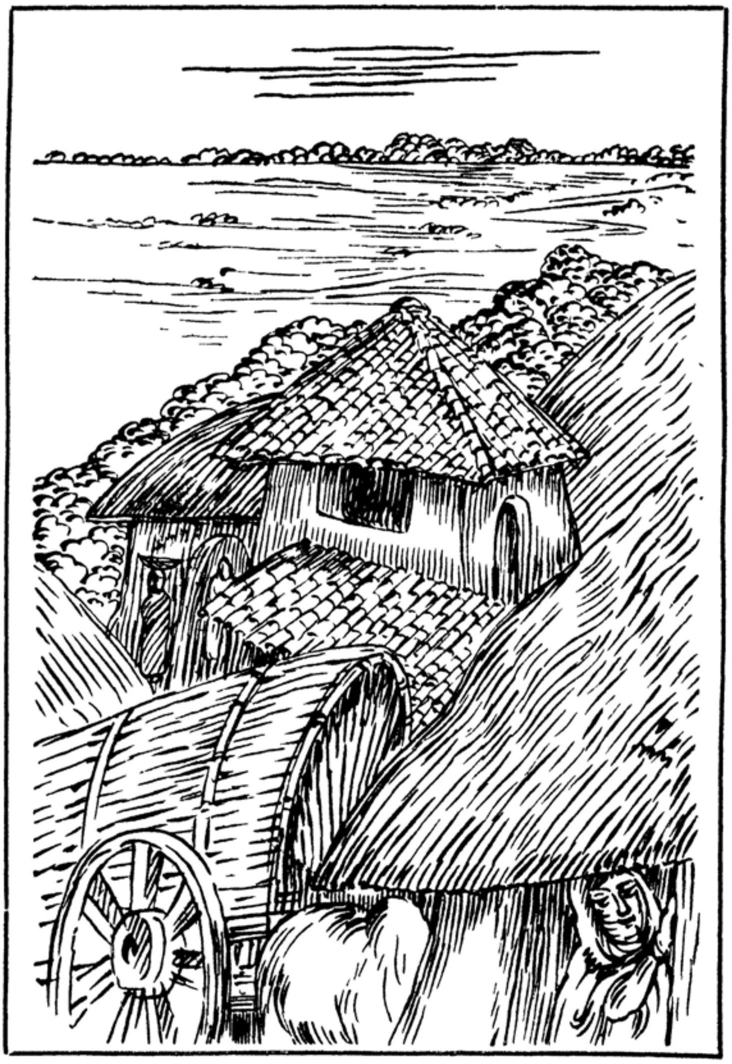

পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে
পাঠিয়ে দিলে দেশ বিদেশের থেকে।
যাহা-তাহা-যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।
ঐ যে গরিব পাড়া,
আর কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্র মাসের মাঠ করছে ধু ধু।
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দাঁড়ায়,
ইচ্ছে ক'রে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ মাড়ায়।
তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে,
সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষনি যায় র'টে।
হঠাৎ তখন ঝেঁকে উঠে আমরা বলি, তাই তো,
দেখার মতোই জিনিস বটে, সন্দেহ তার নাই তো।

ঐযে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম,
নেই বললেই হয় ওরা সব, পোছে না কেউ নাম,—
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো,
অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো।
ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব,
এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।
অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়।
সে সব ছবি সাজে সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধাঁ,
আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।

ওগো, চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এযে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে।
জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে,
সবাই ওঠে হাঁ হাঁ ক'রে সব্‌জি ক্ষেতে দেখলে।
আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে
এক মুহূর্তে চমক লেগে, বলে উঠলেম, কে হে।
ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার,
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# অজয় নদী

এককালে এই অজয়নদী ছিল যখন জেগে
স্রোতের প্রবল বেগে
পাহাড় থেকে আনত সদাই ঢালি'
আপন জোরের গর্ব ক'রে চিকন চিকন বালি।

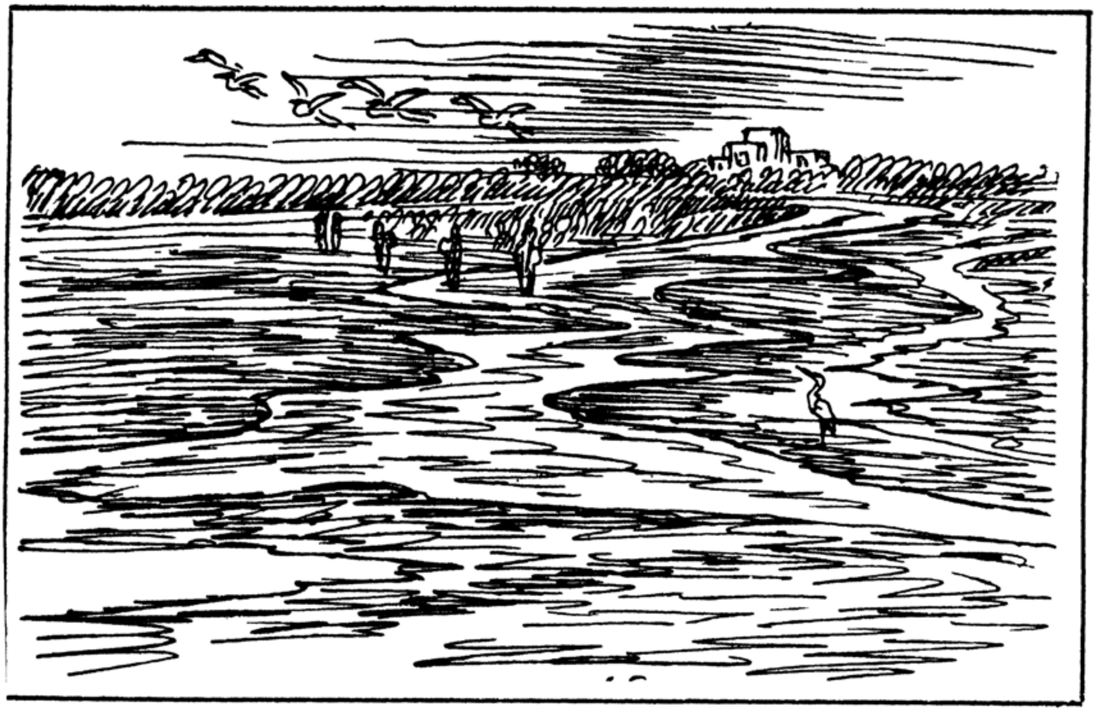

অচল বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে যখন ক্রমে ক্রমে
জোর গেল তার ক'মে,
নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ ক'রে
নদী গেল পিছন পানে স'রে ;

অনুচরের মতো
রইল তখন আপন বালির নিত্য অনুগত।
কেবল যখন বর্ষা নামে ঘোলা জলের পাকে
বালির প্রতাপ ঢাকে।
পূর্বযুগের আক্ষেপে তার ক্ষোভের মাতন আসে
বাঁধনহারা ঈর্ষা ছোটে সবার সর্বনাশে।
আকাশেতে গুরুগুরু মেঘের ওঠে ডাক
বুকের মধ্যে ঘুরে ওঠে হাজার ঘূর্ণিপাক।
তারপরে আশ্বিনের দিনে শুভ্রতার উৎসবে
সুর আপনার পায় না খুঁজে শুভ্র আলোর স্তবে।
দূরের তীরে কাশের দোলা, শিউলি ফুটে দূরে,
শুষ্ক বুকে শরৎ নামে বালিতে রোদ্দুরে।
চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপ্‌নাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অজয়॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# পিছু-ডাকা

যখন দিনের শেষে
চেয়ে দেখি সমুখ পানে সূর্য ডোবার দেশে

মনের মধ্যে ভাবি
অস্ত সাগর তলায় গেছে নাবি
অনেক সূর্য-ডোবার সঙ্গে অনেক আনাগোনা,
অনেক দেখাশোনা,
অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয়,
শক্তিমানের অনেক পরিচয়।
তাদের হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথায় টান লাগে না মনে,
কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুক্‌নো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁঠি মাথায়,
তখন মনে হঠাৎ এসে এই বেদনাই বাজে
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।
ঐ যা-কিছুর ছবির ছায়া তুলেছে কোন্‌কালে
শিশুর চিত্ত নাচিয়ে তোলা ছড়াগুলির তালে ঃ—
তিরপুর্ণির চরে
বালি ঝুরঝুর করে,
কোন্ মেয়ে সে চিকন চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি।
ঐ যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

# ভ্রমণী

মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, সহব নিল মোরে
পোষ্যপুত্র ক'রে।

ইঁটপাথরের আলিঙ্গনের রাখল আড়ালটিকে
আমার চতুর্দিকে।
বই প'ড়ে তাই পেতে হোত ভ্রমণকারীর দেখা
ছাদের উপর একা।
কষ্ট তাদের বিপদ তাদের, তাদের শঙ্কা যত
লাগত নেশার মতো।
পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।
চলার ক্ষুধায় চলতে সে চায় দিনের পরে দিনে
অচেনাকেই চিনে।
লড়াই ক'রে দেশ করে জয় বহায় রক্তধারা,
ভূপতি নয় তারা।
পলে পলে পার যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি',
নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয় পতাকা নাহি,
আপন বোঝা বাহি'
অপথেও পথ পেয়েছে অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা—
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।
সবার চেয়ে মানুষ ভীষণ সেই মানুষের ভয়
ব্যাঘাত তাদের নয়।
তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বিজয়ী।

আষাঢ়
১৩৪৪

# আকাশ প্রদীপ

অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ঐ মেয়ে
আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশপানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে এই কথা সে জানে,
ঐ প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে অচেনা পর্বত,
তারি মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে দুটিতে ভাইবোন।
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে।
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির পরে॥

পতিসর
৮ শ্রাবণ, ১৩৪৪